Solidaridad

ক্ষুদ্র চা চাষের ম্যানুয়াল

সলিডারিডাড নেটওর্য়াক এশিয়া

সহযোগিতায়: ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)

প্রকাশ কাল

ডিসেম্বর ২০২২

সংগ্রহ এবং সংকলন

মো: ফয়েজুল মতিন

কনসালটেন্ট-চা

সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া

এবং

মো: মাহামুদুল আলম

সমন্বয়কারী কর্মকর্তা-চা

সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া

প্রকাশক

ইএসডিও'র টি ভ্যালুচেইন প্রকল্পের একটি প্রকাশনা

মো: আইনুল হক

ডিপিসি, ইএসডিও

এবং

মো: জিয়াউর রহমান

প্রজেক্ট ম্যানেজার

টি ভ্যালুচেইন প্রকল্প

ইএসডিও

কম্পিউটার কম্পোজ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন

মোঃ নাদিমুল ইসলাম

মুদ্রণ

শব্দকলি প্রিন্টার্স

৭০ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

ভূমিকা	৬
চা উৎপাদনে কৃষিতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশল	১৩
সেচ ও পানি নিষ্কাশন	২৬
চা মৃত্তিকার পুষ্টি, জৈব ও অজৈব সার ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহের কৌশল	৩১
সার প্রয়োগ সুপারিশমালা	৩৩
চা আবাদীতে চায়ের রোগ ও আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা	৪১
চায়ের প্রধান প্রধান আগাছাসমূহ ও প্রতিকার	৫১
চায়ের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও এদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা	৫৫
চা কারখানা ব্যবস্থাপনা	৬৫

ভূমিকাঃ

মাঠ পর্যায়ে চা আবাদের জন্য তৎপূর্বে নার্সারীতে চারা উৎপাদন একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। চা আবাদীদের জন্য বীজ ও কাটিং উভয় হতে চারা উৎপাদন করা যায়। বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো যথা সম্ভব স্বল্প সময়ে কম খরচে নির্দিষ্ট জাতের সুস্থ সবল, সজীব ও একই আকার আকৃতির চারা তৈরি করা।

নার্সারী ব্যবস্থাপনাঃ

চা এর বীজ ও কাটিং উভয় হতে তৈরি চারার মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার প্রনালী হলো নার্সারী ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত।

চা নার্সারী

(১) ভিপি নার্সারী

(২) বীজ নার্সারী

ভিপি নার্সারী/ক্লোন নার্সারীঃ

কান্ড তথা ডালপালার সবুজ অংশ হতে বংশবৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া এর অন্তর্গত।

বীজ নার্সারীঃ

বীজ হতে বংশ বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া এর অন্তর্গত। ভিপি নার্সারী/ক্লোন নার্সারীর উদ্দেশ্যেঃ কান্ড তথা ডালপালার সবুজ অংশ হতে বংশবৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য হলো নির্বাচিত গাছ হতে ফলন ও গুণগত মানের দিক হতে সমগুন সম্পন্ন চারা তৈরি করা।

প্রধান প্রধান বিষয়সমূহঃ

(১) পরিকল্পনা

(২) স্থান নির্বাচন

(৩) জমি তৈরি

(৪) ডিজাইন ও লেআউট

(৫) প্রাইমারী বেড ও সেকেন্ডারী বেড তৈরি

(৬) শেড তৈরি

(৭) মাটি তৈরি ও ব্যাগ ভর্তি

(৮) কাটিং তৈরি ও কাটিং রোপন

(৯) সেকেন্ডারী বেডে কাটিং ট্রান্সফার

(১০) রক্ষণাবেক্ষণ

(১১) চারা হার্ডেনিং

পরিকল্পনা:

(১) মাঠে রোপনের উপযুক্ত চারা পেতে হলে এর ১৫-১৮ মাস আগেই কর্মপকিল্পনা হাতে নিতে হয়।

(২) যে পরিমান চা চারা দরকার তার মোট পরিমান নির্ধারন করা দরকার।

(৩) প্রয়োজনীয় পরিমানের অতিরিক্ত ২৫-৩০% চা চারা তৈরি করতে হয়।

(৪) রোগ-বালাই মুক্ত বীজ ও কাটিং নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সংগ্রহ নিশ্চিত করতে হয়।

(৫) মোট যে পরিমান চারা তৈরি করা দরকার ও তার জন্য মোট কি পরিমান জায়গার দরকার হতে পারে তাহা আগেই সুনিশ্চিত করা দরকার।

(৬) কি পরিমান পলিথিন দরকার হতে পারে তার পরিমানও নির্ধারন করা ও অগ্রিম সংগ্রহের ব্যবস্থা করা দরকার।

(৭) কি পরিমান শ্রমিক ও অন্যান্য দ্রব্যাদির দরকার হতে পারে তার পরিমান নির্ধারন করা ও এর জন্য প্রয়োজনীয় খরচের পরিমান নির্ধারন করাও দরকার।

(৮) প্রয়োজনীয় পরিমান ফাংগিসাইড ও ইনসেকটিসাইড এর পরিমান নির্ধারন করা ও সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

নার্সারীর জন্য জায়গা নির্ধারণ:

(১) লোকেশন/অবস্থান: নার্সারী সর্বদাই প্রস্তাবিত চা আবাদীর কাছাকাছি করা ভাল। এতে মাঠে চারা পরিবহনের অতিরিক্ত খরচ ও ঝামেলা এড়ানো সম্ভব।

(২) পানির উৎস: সারা বছর পানি পাওয়া যায় এমন পানির উৎসের কাছাকাছি নার্সারী করা দরকার।

(৩) জলাবদ্ধতার সম্ভবনা নাই এমন সমতল অথচ উচু জায়গা নার্সারীর জন্য উপযুক্ত। তবে ঢালু হলে ১০ ডিগ্রী এর কম ঢালে নার্সারী করা যেতে পারে, ঢাল ১০ ডিগ্রী এর বেশী হলে উক্ত জায়গায় নার্সারী করা ঠিক হবে না।

(৪) ভেজিটেশন: যেখানে সবুজ গাছপালা/ঘাস ভাল জন্মে সেখানে অন্য কোন ফসলও ভাল জন্মে। অনুরুপ জায়গায় চাষের নার্সারীও ভালভাবে করা সম্ভব।

(৫) ড্রেনেজ: সুনিষ্কাশিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে, বৃষ্টির পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য আউটলেটের ব্যবস্থা আছে, এমন জায়গা নার্সারীর জন্য উপযুক্ত।

(৬) মৃত্তিকার গুনাগুন: নার্সারীর জন্য বেলে দোআঁশ মাটি উপযুক্ত। তবে বালির আধিক্য বেশি (৭০%-৯০%) এমন জায়গায় চা নার্সারী ভালভাবে করা সম্ভব নহে।

(৭) ক্যাটল ট্রেসপাস: নার্সারী এলাকায় গরু ছাগলের অবাধ বিচরণ রোগবালাই ছড়ানোসহ নানাধিক সমস্যা তৈরি করে।

(৮) মুক্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে এমন জায়গা নার্সারীর জন্য খুবই উপযুক্ত।

জমি তৈরিঃ

(১) জংগল পরিস্কারঃ জংগল বা আগাছা থাকলে শিকড়সহ তুলে ফেলে পরিস্কার করতে হবে।

(২) জমি কর্ষণঃ প্রাইমারী বেড তৈরির ক্ষেত্রে ০-৯ ইঞ্চি পর্যন্ত মাটি কোদাল দ্বারা উলটপালট করে কর্ষিভাবস্থার সৃষ্টি করতে হয়।

(৩) লেভেলিংঃ বেড তৈরির আগে মাটি ড্রেসিং করে লেভেল করা চাই।

ডিজাইন এবং লেআউটঃ

(১) প্রাইমারী বেডঃ মোট কাটিং এর পরিমান অনুযায়ী ৩ইঞ্চি X ৩ইঞ্চি স্পেসিং দিয়ে দিয়ে লাগানোর ক্ষেত্রে কতটি প্রাইমারী বেড লাগতে পারে তা নির্ধারণ করা ও স্টেকিং করা।

(২) কি পরিমান সেকেন্ডারী বেড দরকার হতে পারে তাও নির্ধারণ করা চাই।

(৩) ড্রেনের প্রশস্থতা, গভীরতা ও প্রয়োজনীয় পথের পারিমান স্টেকিং করা, মোট প্রয়োজনীয় কাটিংএর পরিমান ও রোপন দূরত্ব অনুযায়ী প্রতিটি বেডে কি পরিমান কাটিং লাগানো সম্ভব তাও নির্ধারণ করা চাই।

(৪) বীজ নার্সারীঃ এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমান বীজের জন্য বেডের পরিমাণ নির্ধারণ ও প্রতিটি সিড বেডে কতটি গুটি বা বীজ লাগানো সম্ভব তাও নির্ধারণ করা দরকার।

(৫) প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় ও বিবেচনায় আনা।

প্রাইমারী বেড ও সেকেন্ডারী বেড তৈরিঃ

(১) ক্লোন নার্সারী বেড অর্থাৎ কাটিং লাগানোর বেড সর্বদাই উত্তর দক্ষিন দিক বরাবর তৈরি করতে হয়। প্রাইমারী বেড তৈরি করার সময় লক্ষ্য রাখা দরকার যেন সঠিক ভাবে দূরমুজ করা হয়।

(২) গুটি নার্সারীর বেড পূর্ব-পশ্চিম দিক। তৈরি করতে হয়।

(৩) প্রাইমারী বেড শীতকালে ফ্লাট/সমতল এবং বৃষ্টি মৌসুমে ওভাল বা উত্তল আকৃতির করে তৈরি করতে হয়।

(৪) সেকেন্ডারী বেড পূর্বদিকে সামান্য ২ ইঞ্চির মত স্ল্যান্টিং বা ঢালু করে তৈরি করতে হয়।

(৫) সেকেন্ডারী বেড এর উপর ১ ইঞ্চির মত বালির স্তর দিলে সহজে জলাবদ্ধতা এড়ানো যায়।

(৬) সাইড ড্রেন ৩০ সেমি. (১ ফুট) প্রশস্থ ২৩ সেমি. (৯ইঞ্চি) গভীর করে তৈরি করা দরকার।

ওভারশেড তৈরি:

(১) নার্সারীর জন্য ওভারশেড তৈরি একটি অপরিহার্য বিষয়।

(২) প্রাইমারী বেডে ব্যবহৃত বাঁশের চাপ্টা এমনভাবে তৈরি করতে হয়, যাতে ২০-২৫% সূর্য্যলোক বেডে প্রবেশ করতে পারে।

(৩) বাঁশের চাপ্টা ৫ ফুট X৪ ফুট সাইজের হওয়া চাই। চাপ্টা এর থেকে বেশী লম্বা হলে রক্ষণাবেক্ষনে এ সমস্যা হওয়ায়, চাপ্টা বেশিদিন টেকসই হয় না। এইরুপ ১০টি চাপ্টা দিয়ে ৫০ ফুট লম্বা একটি বেড ঢাকানো সম্ভব।

(৪) সরাসরি মাটিতে লাগানো বীজ নার্সারীর জন্য সবুজ ছায়া শস্য হিসাবে বগামেডিওলা প্রত্যেক বেডের বর্ডার বরাবর লাগানো যায়।

(৫) প্রাইমারী বেডে বাঁশের চাপ্টা ২৫-৩০ সে.মি. (১০-১২ইঞ্চি) উঁচুতে (শোশেড হাইট) এবং সেকেন্ডারটী বেডে বাঁশের চাপ্টা ড্রেন হতে ১৭৮ সে.মি. (৬ফুট) উঁচুতে (হাই শেড হাইট স্থাপন করতে হয়।

(৬) সেকেন্ডারী বেডে, বাঁশের চাপ্টা ছাড়াও কাঁশসন বা এগ্লোনেট ব্যবহার করা যায়।

মাটি তৈরি ও ব্যাগভর্তি:

মাটি সংগ্রহ:

(১) বাঁশবাড়ী ও জংগলবাড়ি হতে সংগৃহিত মাটি, বা যে কোন পুনর্বাসন করা ঝুরঝুরে মাটি উত্তম।

(২) বেলে দোঁআশ মাটি উত্তম এবং এক্ষেত্রে টপ সয়েল ব্যাগ ভর্তির জন্য উত্তম।

(৩) ক্র্যাম্ভি স্ট্রাকচারড সয়েল ভাল।

(৪) পিএইচ ৪.৫ হেত ৫.৫ হলে ভাল হয়।

(৫) মাটি সংগ্রহের জন্য উত্তম সময় হল শীতকাল।

(৬) ইলওয়্যার্ম (Eeelworm) এর সংখ্যা ৯০ গ্রাম মাটিতে ৭টির বেশি হলে ফুরাডান দিয়ে মাটি শোধন করে নেওয়া দরকার।

মাটি তৈরি:

(১) মাটি শুকনা ও পরিস্কার হওয়া দরকার।

(২) প্রয়োজনে মাটি ও মেসের চালুনী দ্বারা ঢেলে নেয়া যায়।

(৩) সয়েল ও গোবর এর অনুপাত ৪:১ হওয়া দরকার।

(৪) ব্যাগ ভর্তির জন্য সংগৃহিত মাটি তৈরির সময় প্রতি কিউবিক মিটার মাটিতে ৫০০ গ্রাম টিএসপি সার ব্যবহার করা যায়।

ব্যাগ ভর্তি:

(১) পলিব্যাগের সাইজ ০.০৪ মিমি থিকনেস X ১৫সে.মি. প্রশস্থ X ২২ সে.মি লম্বা অথবা ০.০৪ মিমি X ১২.৫ সে.মি. X ২০ সে.মি আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়।

(২) ব্যাগ ভর্তির পূর্বে মাটি শুকনা হলে কিছুটা আর্দ্র করে নেয়া দরকার। কাটিং ট্রান্সফারের অন্তত ১৫-১৬ দিন আগে ব্যাগ ভর্তি করে রাখলে, ও মাঝে মাঝে পানি দিলে মাটি সেটিং হওয়া সহ অবাঞ্ছিত আগাছা বীজ জন্মানোর সুযোগ হয় যা পলিব্যাগে কাটিং বসানোর সময় সহজভাবে দূরিভূত করা সম্ভব হয়।

(৩) তৈরিকৃত মাটি দ্বারা ব্যাগ ভর্তির সময় ব্যাগের উপরাংশে ৫ সে.মি. খালি রেখে পরবর্তীতে সাবসয়েল দ্বারা ভর্তি করা দরকার এতে কাটিং হতে শিকড় বেড হওয়ার পর গোবর ও সার মিশ্রিত মাটি নিচের দিকে থাকায় শিকড় নিম্নমুখী হয়, যাহা কাম্য।

(৪) রংগিন পলিথিন তাপ শোষণ করে দ্রুত গরম হয় ফলে ব্যাগের মাটি তাড়াতাড়ি শুকানো যায়, এইজন্য পলিব্যাগ হিসাবে রংগিন পলিথিন ব্যবহার না করাই ভাল।

(৫) পলিথিন টিউব বসানোর সময় ত্রিকোনাকার সিস্টেমে বসালে ব্যাগের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গার পরিমান সহজেই কমানো যায়, এতে সামগ্রীকভাবে নার্সারীর বেডকে শুকিয়ে যাওয়ার হাত রক্ষা করা যায়।

কাটিং তৈরি:

শুট সংগ্রহ:

(১) নিউক্লিয়াস ক্লোন প্লট হতে স্ট্যান্ডার্ড শুট সংগ্রহের পরপরই আর্দ্র শীতল ছায়াময় জায়গায় রাখতে হয় ও মাঝে মাঝে পানি দেয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

(২) আধা শক্ত আধা বাদামী ডাল বা শুট কাটিং সংগ্রহের এর জন্য উপযুক্ত।

(৩) কাটিং সর্বদাই প্রাইমারী শুট হতে সংগ্রহ করতে হয়। সেকেন্ডারী বা টারশিয়ারী শুট হতে সংগৃহীত কাটিং কখনই ভাল হয় না।

(৪) শুট সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হল সকাল অথবা বিকাল।

(৫) মাদারবুশ হতে শুট সংগ্রহের সময় ধারালো দা ব্যবহার করতে হয়।

কাটিং সংরক্ষণঃ

(১) সংগৃহিত কাটিং বোল বা গামলায়, ভিজা সিক্ত অবস্থায় সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

(২) পরিবহন করে দূরে নেয়ার ক্ষেত্রে সংগৃহীত কাটিং ভিজা সিক্ত চটের বস্তা অথবা ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগে ভিজাসিক্ত অবস্থায় পরিবহন করে নেয়া যায়। এভাবে সংগৃহীত কাটিং সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত সংরক্ষণ করে লাগানো যায়।

কাটিং রোপনঃ

(১) যদিও কাটিং সংগ্রহের পর হতে সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত লাগানো যায়, উত্তম হল সংগৃহীত কাটিং যথাসম্ভব দ্রুত লাগানো।

(২) কাটিং লাগানোর আগে ২% ফাংগিসাইডে শোধন করে নেয়া ভাল।

(৩) কাটিং লাগানোর উত্তম সময় হল সকাল অথবা বিকাল।

(৪) সরাসরি পলিব্যাগে লাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রয়োজন পরিমান পানি প্রদানসহ অন্যান্য বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।

(৫) কাটিং লাগানোর সময় দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে হয়, লক্ষ্য রাখতে হয় যেন কোন এয়ার পকেট না থাকে।

(৬) কাটিং এমনভাবে লাগাতে হয় যেন কাটিং এর বোটা বা পেটিগুল মাটির ওপরে থাকে। বোটা মাটির নিচে গেলে পঁচে যেতে পারে।

(৭) ক্লোন নার্সারী বেড সর্বদাই উত্তর-দক্ষিণ বরাবর লাগাতে হয়।

(৮) তৈরি বেড শুকনা হলে কাটিং লাগানোর পূর্বে অবশ্যই পানি দ্বারা সিক্ত করে নিতে হবে।

(৯) কাটিং ৩ ইঞ্চি X৩ ইঞ্চি স্পেসিং দিয়ে লাগাতে হয়।

কাটিং স্থানান্তরঃ

(১) বেডে লাগানো কাটিং এর নিম্নাংশে ক্যালসিং হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ করা, এর জন্য ৬-১০ সপ্তাহ সময় লাগে

(২) শুট এর বৃদ্ধি ৭-১০ সে.মি. তথা ৩-৪ পাতা এবং একই সাথে শিকড়ের বৃদ্ধি ২-৩ সেমি হলে পলিব্যাগে নেয়ার উপযুক্ত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। সাধারণত এতে ৪-৬ মাস সময় লাগে।

(৩) লোহার তৈরি ফর্মা দিয়ে প্রাইমারি বেড হতে কাটিং এমনভাবে ট্রান্সফার করতে হয়, যেন কাটিং এর গোড়ার মাটি বল/ভেটি/পিন্ডি না ভাংগে।

(৪) ভেটি ভেংগে গেলে শিকড় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় উক্ত কাটিংকে ব্যাগে টিকানো কঠিন হয়ে পড়ে। পুনঃবৃদ্ধি দেরীতে শুরু হয়।

মেইনটিন্যান্সঃ

(১) নিয়মিত পানি দেয়া দরকার।

(২) বেড অথবা ব্যাগ হতে মাটি আউট হলে সাথে সাথে পুনরায় মাটি দিয়ে সমান করে দেয়া দরকার।

(৩) প্রয়োজন মাফিক উইডিং করা দরকার।

(৪) অ্যালজি বা মস হলে, বা হার্ড ক্রাস্ট তৈরি হলে বাঁশের কাঠি দিয়ে হ্যান্ট ককিং করে দূর করা যায়।

(৫) প্রাইমারী বেডের ড্রেনে অতিরিক্ত পানি যাতে কোন অবস্থাতেই জমে না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

(৬) প্রাইমারী বেডে ডাইব্যাকের আক্রমণ হতে পারে, উইপোকার আক্রমণ হতে পারে, এছাড়া উভচুংগা পোকা কাটিং এর গোড়া কেটে দিতে পারে। শেডের অপ্রতুলতার কারণে লালমাকড়ের আক্রমণ হতে পারে, মাকড় দমনের জন্য মাইটিসাইট ব্যবহার করতে হবে।

হার্ডেনিংঃ

চা চারা রোপনের পূর্বে মাঠে রোপন উপযোগী করার জন্য হার্ডেনিং বা চারা শক্ত করে নেয়া একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এইজন্য চা চারা রোপনের শেড হতে দুই মাস পূর্বে শেড উন্মুক্ত করে চারা হার্ভেনিং করে দিতে হয়।

নার্সারীতে ছায়া গাছের চারা তৈরিঃ

চা বাগানে ছায়া গাছ উত্তোলণ একটি অবিচ্ছেদ্য প্রক্রিয়া। বিটিআরআই অনুমোদিত স্থায়ী ছায়া গাছ (১) আলবিজিয়া অডোরাটিসিমা (২) আলবিজিয়া লেবেক ও (৩) ডেরিস রোবাস্টা স্থায়ী ছায়াগাছ হিসাবে নার্সারীতে চারা তৈরিপূর্বক চা বাগানে লাগানো যায়। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বীজ সংগ্রহ পূর্বক ছায়া গাছের চারা উত্তোলণ করতে হয়।

চা উৎপাদনে কৃষিতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ কলাকৌশল

চা চারা রোপণঃ

বাংলাদেশে চা চাষের আওতাধীন জমির বেশিরভাগই টিলা (প্রায় ৬০%) এছাড়া কিছু চা আবাদি জমি রয়েছে যা উঁচু কিন্তু সমতল। বর্তমানে দেশের উত্তরের চা উৎপাদনকারী জেলাগুলো যেমন- পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট সমতলভূমিতে ভালভাবে যে চাষ হচ্ছে। তবে যে জমির বর্ষাকালে পানি জমে থাকে সেখানে কোন ভাবেই চা চারা রোপণ করা যাবেনা কারণ চা গাছ দাঁড়ানো পানি একদম সহ্য করতে পারেনা।

টিলা জমিতে মাটি বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাই সেখানে কন্টুর পদ্ধতিতে চা চাষ করা হয়। প্রথমে ঐ স্থানটি ভালভাবে পরিষ্কার করে, গর্ত থাকলে তা সমান করে অতঃপর কন্টুর পদ্ধতির জন্য লাইন এবং পথ তৈরি করতে হবে। টিলাতে ৬ থেকে ১৮ মিটার দূরে দূরে কন্টুর পথ তৈরি করা প্রয়োজন। কন্টুর পথই সেখানে পানি নিষ্কাশনের নালা হিসাবে কাজ করে। কন্টুর নালার গভীরতা ৪৫ সে.মি. ও প্রস্থ ৩০ সে.মি হিসেবে ধরে টিলার ভিতরের দিকে সামান্য ঢালু করে কাটতে হয়।

সমতল ভূমিতে চা চাষের জন্য প্রথমে মাটির উপরিভাগ সমান করে নিতে হয় এবং আগাছা বাছাই করে নিয়ে স্থানটি পরিষ্কার করতে হয়। জমি সমতল হওয়ায় বর্ষাকালে যেন পানি না দাঁড়ায় সেজন্য একটু গভীর করে ঘন ঘন নালা তৈরি করতে হয়। জমির আকৃতি-প্রকৃতি অনুসারে নালার ব্যবধান ৬ মিটার থেকে ১৮ মিটার, নালার প্রস্থ ০.৫ মিটার থেকে ১.০ মিটার এবং গভীলতা ০.৫ মিটার থেকে ১.৫ মিটার হতে পারে।

বিভিন্ন পদ্ধতিতে চা চারা রোপণ করা হয়ে থাকে যথা- একক সারি পদ্ধতি (single hedge row) ও দ্বৈত সারি পদ্ধতি (double hedge row)। এছাড়াও চারা রোপণে, সুবিধা অনুযায়ী আয়তাকার পদ্ধতি (rectangular system) বা ত্রিকোণাকার পদ্ধতি (tri-agular system) অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত সমতল ভূমিতে চা চারা রোপণে আয়তাকার পদ্ধতি এবং টিলাতে ত্রিকোণাকার পদ্ধতি বেশি উপযোগী। টিলাতে ত্রিকোণাকার পদ্ধতিতে রোপণের ফলে বর্ষার সময় ভূমি ক্ষয় অনেকটা কম হয়। কোন একক বা আবাদি জমিতে কতগুলো চারা রোপণ করতে হবে তা চারা হতে চারার দূরত্ব এবং সারি হতে সারির দূরত্ব কত রাখা হবে তার উপর নির্ভর করে, যা নিম্নরুপ হয়ে থাকে-

সারি হতে সারি x চারা হতে চারার দূরত্ব	রোপিত চা চারা সংখ্যা / হেক্টর (হিসাবকৃত)
৩.৫ ফুট x ২ ফুট [একক সারি]	১৫,৮৭৩
৩ ফুট x ২ ফুট	১৮,৫১৮
২ফুট x ২ফুট x ৪ ফুট [দ্বৈত সারি]	১৮,৫১৮
২ফুট x ২ফুট x ৫ফুট	১৫,৮৭৩

চা বাগানে চা'র ফলন (কেজি/হেঃ) কেমন হবে তা বহুলাংশে নির্ভর করে ঐ বাগানে হেক্টর প্রতি কত চা গাছ আছে তার ওপর। গবেষণায় দেখা গেছে, চা'র ভাল ফলন পাওয়ার জন্য প্রতি হেক্টরে ১৫,০০০ চা গাছ থাকা উচিত, হেক্টর প্রতি চা গাছের সংখ্যা ১৩,০০০-এর কম হলে ফলন কমতে থাকে। আবার রোপণের সময় বেশি ঘন করে লাগালে পূর্ণ বয়স্ক চা গাছ থাকলে সেখানে ফলন কমে যায়। অন্যদিকে, পুরনো চা আবাদি জমিতে দেখা যায় সেখানে অত্যন্ত দীর্ঘ স্প্যাসিং দিয়ে চা চারা রোপণ করা হয়েছিল, ভ্যাকান্সি অনেক বেশি যার দরুন হেক্টর প্রতি ৮,০০০ টি চা গাছও চোখে পরেনা ফলশ্রুতিতে চা'র ফলন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম হয়।

সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে খরা মৌসুম তথা শীতকালে চা চারা রোপণ করা ভাল। ডিসেম্বর হতে মার্চ, এই সময়ের মাঝে রোপণকে শীতকালীন রোপণ বলে (winter planting) আবার, সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষা শুরুর প্রারম্ভে চা চারা রোপণ করা উত্তম। একে প্রাক-বর্ষাকালীন রোপণ বলে (early-monsoon planting) সাধারণভাবে এপ্রিল-মে মাস এই সময়ের মধ্যে পরে। পূর্ণ বর্ষার সময় চা চারা রোপণের কাজ পরিহার করা হয় কারণ ঐ সময় রোপণ করে দেখা গেছে চারা মৃত্যুর হার তুলনামূলক বেশি হয়।

চা চারা সারিতে, নির্দিষ্ট দূরত্বে রোপণ করা হয়। যেন এলোমেলো না হয়, সেজন্য চারা রোপণের পূর্বে স্ট্যাকং করে নিতে হয়। চারা লাগানোর নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে সঠিক মাপের গর্ত করে নিতে হয়। ক্লোন চারার জন্য গর্তের মাপ (গভীরতা ৩০-৩৫ সে.মি এবং প্রশস্ততা ২৫-৩০ সে.মি) আর বীজের চারার জন্য গর্তের মাপ (গভীরতা ৪০-৪৫ সে,মি এবং প্রশস্ততা ২৫-৩০ সে.মি) ভিন্ন হয়ে থাকে। কারণ বীজের চারায় প্রধান মূল থাকে যা মাটির অনেক গভীরে প্রবেশ করে কিছু ক্লোন চারায় ইহা থাকেনা।

গর্ত তৈরির সময় খেয়াল করে উপরের মাটি (০-২০ সে.মি) আলাদা করে একপাশে রাখতে হয় কারণ ইহা অপেক্ষাকৃত উর্বর মাটি। এবং নিচের মাটিটা অন্যপাশে রাখতে হয়। উপরের মাটির সাথে ২ কেজি পচা গোবর সার, ৩০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্তের তলায় দিতে হবে। অতঃপর চারা বসিয়ে গর্তের বাঁকি অংশ প্রথমে সার মেশানো অবশিষ্ট মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে তারপর গর্তের আলাদা করা নিচের মাটি উপরিভাগে দিয়ে গর্ত ভালোভাবে ভরাট করে র‍্যামিং করে দিতে হবে।

চা চারা রোপণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়:

১. সঠিক বয়সের (১২-১৪ মাস) এবং সুস্থ চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এখানে বলা যায়, রোপণের জন্য আদর্শ চা চারার কান্ডের ডায়ামিটার হবে পেন্সিলের মত মোটা, চারাটি হবে ১৫-২০ টি পাতা সম্পন্ন ৪০-৫০ সে.মি. উচ্চতা বিশিষ্ট।

২. খেয়াল রাখতে হবে চারা রোপণের জন্য পবিহণের সময়, গর্তে রোপণের সময় অথবা র‍্যামিং করার সময় চারার পিডিতে আঘাত না লাগে এবং উহা যেন ভেঙ্গে না যায়। কারণ পিডি ভেঙ্গে গেলে চারার শিকড় যুক্ত মাটি হতে আলগা হয়ে পড়ে এবং চারা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়।

৩. গর্তে চারা বসানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে চারার গোঁড়া ভূমি-তল হতে একটু উপরে থাকে এবং মাটি বসে গেলে তা যেন ভূমি-তলের সমান হয়ে যায়। অন্যদিকে, চারার গোঁড়া-ভূমি-তল হতে নিচু হলে সেখানে বর্ষাকালে পানি জমে থাকে এতে অনেকক্ষেত্রেই শিকড় পচে যায় এবং চা চারা মারা যায়।

৪. চারা রোপণের পর আলগা মাটি এবং মাটির রস সংরক্ষণের জন্য চারার গোঁড়া হতে ৭-১০ সে.মি. দূরে এবং ৮-১০ সে.মি. পুরু করে মালচ দেওয়া ভাল। মালচ হিসাবে কচুরিপানা, গুয়াতেমালা ও সাইট্রোনেলো ঘাস, এমনকি ঝোপ-জঙ্গল কেটে এনে বিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং বয়স্ক চা গাছের প্রুনিং:

নার্সারি হতে চা চারা নিয়ে প্রকৃত জমিতে রোপণ করার পর হতে সাধারণত ৫ বছর বয়স পর্যন্ত চা গাছকে অপ্রাপ্ত চা গাছ (Young tea/Immature tea) বলা হয় এবং ৬ বছরে গিয়ে প্রথম এল.পি (প্রথম এই Light pruning -কে Formative pruning বলা হয়) করা হয়; এর পর হতেই চা গাছ প্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছ (Mature tea) হিসাবে পণ্য করা হয়। অপ্রাপ্ত চা গাছ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছে প্রুনিং-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং কলাকৌশল-এর মধ্যে কিছু ভিন্নতা আছে যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হল-

টেবিল-১ বয়স অনুযায়ী বয়সের চা চারা প্রুনিং করার কলাকৌশল বাচ্চা চারার বয়স	প্রুনিং পদ্ধতি	প্রুনিং উচ্চতা	টিপিং উচ্চতা
১ম বছর	ডি-সেন্টারিং/ব্রেকিং	১৫-২৩ সেমি/৬-৯ ইঞ্চি	৫০সেমি/২০ইঞ্চি
২য় বছর	প্রুনিং	৩৫-৪০সেমি/১৪-১৬ইঞ্চি	৫৫-৬০সেমি/২২-২৪ইঞ্চি
৩য় বছর	স্কিফ	৫০-৫৩সেমি/২০ইঞ্চি	৫৩-৫৫সেমি/২১-২২ইঞ্চি
৪র্থ বছর	প্রুনিং	৫০সেমি/১৮ইঞ্চি	৭০-৭৫-সেমি/২৮ইঞ্চি
৫ম বছর	স্কিফ	৭৫সেমি/২৮ইঞ্চি	৭৬-৮০সেমি/৩০-৩১ইঞ্চি

চারা রোপণ:

সময়ঃ এপ্রিল/মে-প্রাক-বর্ষাকালীন রোপণ (Early monsoon planting): সেচের ব্যবস্থা না থাকলে;
ডিসেম্বর/মাচ-শীতকালীন রোপণ (Winter planting) সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত থাকলে;
দূরত্ব: নিম্নবর্ণিত মাপ অনুযায়ী রোপণের দূরত্ব রাখতে হয়।

রোপণ সারি

একক সারি প্রাণালী (Single hedge planting)

টিলাতে রোপণ দূরত্ব ঃ সারি থেকে সারি ৯০ সে.মি. ও চারা থেকে চারা ৬০ সে.মি. = হেক্টর প্রতি ১৮.৫১৮ টি গাছ।

সমতল ভূমিতে দূরত্বঃ সারি থেকে সারি ১০৭ সে.মি. ও চারা থেকে চারা ৬০ সে.মি. = হেক্টর প্রতি ১৫ ,৫৭৬ টি গাছ।

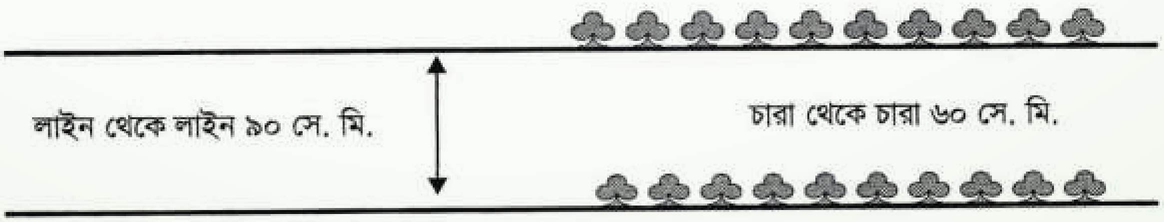

চিত্র-১ : একক সারি রোপণ পরিকল্পনা।

দ্বৈতসারি প্রণালী (Double hedge planting) ১০৭ সে.মি x ৬০ সে.মি. x ৬০ সে.মি. = হেক্টর প্রতি ১৯ ,৯৬০টি গাছ।

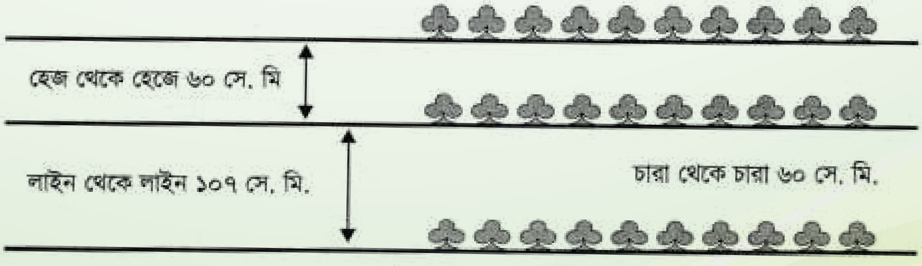

চিত্র-২: দ্বৈত সারি রোপণ পরিকল্পা

রোপণ গর্তের মাপ:

ক্লোন চারার জন্য-	**গভীরতা ৩০ সে.মি-৩৫ সে.মি**
	প্রশস্ততা ২৫ সে.মি-৩০ সে.মি
বীজ চারার জন্য -	**গভীরতা ৪০ সে.মি-৪৫ সে.মি**
	প্রশস্ততা ২৫ সে.মি-৩০ সে.মি

রোপণ পদ্ধতি:

চারা সাবধানে বীজতলা অথবা কাটিং নার্সারি থেকে উঠাতে হতে যাতে ব্যাগ থেকে মাটি খসে শেকড় বেরিয়ে না পড়ে, অথবা মাটির পিণ্ডি ভেঙ্গে না যায়। ৪০-৫০ সে.মি. উচ্চতাসম্পন্ন সুস্থ সবল চারা ব্যবহার করতে হবে। গর্তের প্রথম ২৩ সে.মি. মাটি (৩নং চিত্রের ক নমুনা) গর্তের একপাশে তুলে রেখে এ মাটির সাথে প্রতিটি গর্তের জন্য ২ কেজি পচা গোবার সার, ৩০ গ্রাম টিএসপি ও ১৫ গ্রাম এমপি সাথে মেশাতে হবে (চিত্রের ক+গ নমুনা)। সারমিশ্রিত এ মাটি গর্তের নীচে দিতে হবে। গর্তের ২৩ সে.মি. থেকে নীচের তোলা ও পৃথক করে রাখা মাটি (৩নং চিত্রের খ নমুনা) গুড়া করে চারার অবশিষ্ট গর্ত ভরাট করে এবং চতুর্দিকে বিছিয়ে আস্তে আস্তে দুর্মুজ দিয়ে চেপে দিতে হবে। গর্ত থেকে চারার গোড়া (কান্ড ও মূলের সংযোগস্থল) ১ সে.মি. মাটির উপরে রাখতে হবে। দুর্মুজ যেন বেশি শক্ত অথবা নরম না হয়। টিলাতে রোপণের সময় এই গোড়া গর্তের সমান অথবা ১ সে.মি. নিচে রাখতে হয়। চারার গোড়াতে যাতে পানি না জমে এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

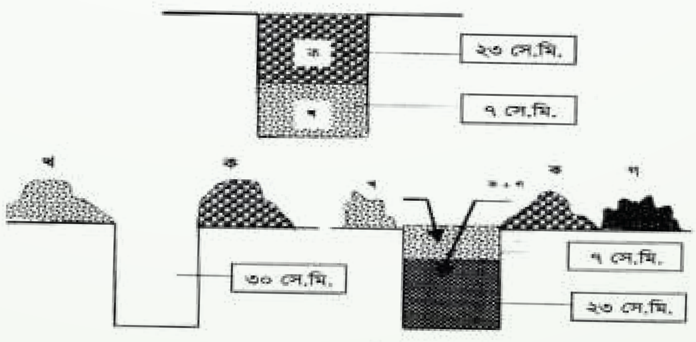

রোপণ গর্তে মাটির ব্যবস্থাপনা

শুষ্ক মৌসুমে চা গাছ তলায় মাল্চ বিছানো পদ্ধতি।

চিত্র-৩

পুনর্বাসন ঘাস

গুয়াতেমালা পুনর্বাসন ঘাস

সাইট্রোনেলা পুনর্বাসন ঘাস

রোপণ - একক সারি ও দ্বৈত সারি পদ্ধতি

একক সারি রোপণ ও অস্থায়ী ছায়া

একক সারির রোপণ আবাদী

দ্বৈত সারির রোপণ আবাদী

চা গাছ ছাঁটাই (কলম) ঃ প্রাথমিক পদ্ধতি

কেন্দ্রচ্ছেদন (ডিসেন্টারিং)

: ভঙ্গন (ব্রেকিং)

: বক্রন/বাহু বন্ধকরণ (বেন্ডিং/পেগিং)

চিত্র-৪

চা গাছের ছাঁটাই ও টিপিং

বিভিন্ন প্রুনিং স্তর

একটি এলপি যোগ্য অল্প বয়স্ক চা আবাদী

সর্বপ্রথম এলপি ছাঁটাই

ডিপ স্কীফ ছাঁটাই

লাইট স্কীফ ছাঁটাই

অতি পুরাতন গাছের এম পি ছাঁটাই

টিপিং উচ্চতা নির্ধারণ

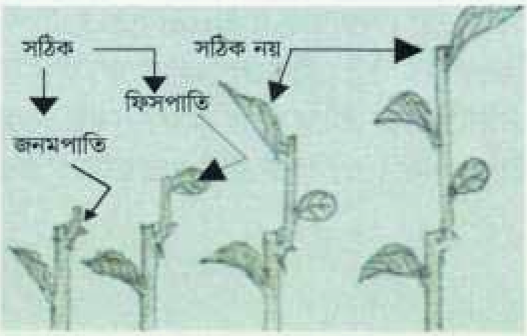

টিপিং নির্ণয়ী স্তর

প্রথম টিপিং উচ্চতা

চিত্র-৫

চা-চাষে ব্যবহৃত গ্রীন ক্রপ, অস্থায়ী ও স্থায়ী ছায়াগাছ

মাইমোজা গ্রীন ক্রপ

ক্যালাপোগোনিয়াম গ্রীন ক্রপ

বগামেডুলা গ্রীন ক্রপ ও অস্থায়ী ছায়া

ক্রোটালারিয়া গ্রীন ও অস্থায়ী ছায়া

ইন্ডিগোফেরা অস্থায়ী ছায়া

অডোরেটিসিমা স্থায়ী ছায়াগাছের চারা

লেবেক স্থায়ী ছায়াগাছের চারা

ডেরিস স্থায়ী ছায়াগাছের চারা

চিত্র-৬

টেবিল-২ পূর্ণবয়স্ক চা গাছের প্রুনিং ও টিপিং পদ্ধতিঃ

৪ বছরের প্রুনিং চক্র	প্রুনিং ধরণ	প্রুনিং উচ্চতা	টিপিং উচ্চতা
১ম বছর (পু চক্র)	এল.পি	৫৫-৮০সেমি/(২২ইঞ্চি)*	৩০ ইঞ্চি
২য় বছর	ডি.এস.কে	৬৫-৯০সেমি/(২৬ইঞ্চি)	৩০ ইঞ্চি
৩য় বছর	এম.এস.কে	৭০-৯৫সেমি/(২৮ইঞ্চি)	৩০ ইঞ্চি
৪র্থ বছর	এল.এস.কে	৭২-৯৭সেমি/(২৯ইঞ্চি)	৩০ ইঞ্চি
৫ম বছর	এল.পি	২৩ ইঞ্চি*	৩০ ইঞ্চি

টিপিংঃ

একটি সুবিধাজনক উচ্চতার প্ল্যাকিং টেবিল দ্রুত তৈরির জন্য প্রুনিং-এর পর নতুন আসা কচি ডগাগুলোকে এ্যালাউন্স দিয়ে নির্দিষ্ট উচ্চতায় ভেঙ্গে পাতা আহরন করাকেই টিপিং বলে। টিপিং প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিরামহীনভাবে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পাতা চয়নের ফলে চা গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি যাতে ব্যহৃত না হয়। সে কারণে গাছে প্রচুর পরিমানে খাদ্য প্রস্তুতের জন্য স্বালকসংশ্লেসণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে সবুজ পত্রতলের পরিমান ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে টিপিং করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ গাছে প্রয়োজনীয় পরিমান মেইনটেনেন্স পাতা সংরক্ষণ নিশ্চিত করা। যদি তা করা না যায় তা হলে গাছের প্রয়োজনীয় পরিমান খাবার তৈরি হবে না। এতে ধীরে ধীরে গাছ দূর্বল হয়ে যাবে এবং উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে। চা গাছ-কে প্লাকিং বা পাতা চয়নের জন্য প্রস্তুত করে তোলা এবং প্লাকিং-এর জন্য একটি সম উচ্চতার প্লাকিং টেবিল সৃষ্টিই হচ্ছে টিপিং এর মূল কাজ। টিপিং-এর সময় মাঠ থেকে ফসলের বিষয়টি একান্তই গৌণ। কচি ডগাগুলো প্রুনিং মার্ক হতে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতা অতিক্রম করার পরই ভাঙ্গা হয় যেন গাছের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে পর্যাপ্ত পাতা অবশিষ্ট থাকে এবং প্রয়োজনীয় পরিমান খাদ্য উৎপাদন করতে পারে। প্রুনিং-এর ধরন অনুযায়ী প্রুনিং পরবর্তীতে গাছে বিদ্যমান পাতার সংখ্যায় ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এজন্য গাছকে পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরিতে সুযোগ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রুনিং এর ধরন অনুযায়ী টিপিং উচ্চতা ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- এল পি এর পর নতুন গজানো ডালায় ৫টি পাতা অথবা ৮ ইঞ্চি ছেড়ে দিয়ে উপরের অংশ উত্তোলন/টিপিং করা হয়। অনুরুপভাবে ডিএসকে, এমএসকে ও এসএসকে এর পর যথাক্রমে ৩,২ ও ১ টি করে পাতা অথবা ৪ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি এবং ১ ইঞ্চি উচ্চতা ছেড়ে টিপিং করা প্রয়োজন।

প্লাকিং

টিপিং পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর চা পাতা আহরন/উত্তোলন করাকেই প্লাকিং বলে। আমাদের দেশে পূর্ন চা উৎপাদন মৌসুমে সাধারনত ৭ দিন অন্তর প্লাকিং করা হয় এবং একে প্লাকিং রাউন্ড বলে। তবে মৌসুম অনুযায়ী এই প্লাকিং রাউন্ড আমাদের দেশে ৭ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত হতে পারে। চা তৈরির উদ্দেশ্যে প্লাকিং-এর মাধ্যমে চা গাছ হতে কঁচি ডগা উত্তোলন করা হয়। গাছ হতে সংগৃহীত ডগাসমূহে কুড়ি ও পাতার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্লাকিং-কে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমনঃ ফাইন প্লাকিং, মিডিয়াম প্লাকিং এবং কোর্স প্লাকিং।

চয়নকৃত চা পাতার মান-গাছ থেকে আহরিত পাতার গুনগত মান এবং আহরিত সুটের যে অংশ চা গাছের সঙ্গে লেগে থাকে তার অবস্থা বিবেচনা করে প্লাকিং-এর মান নির্দ্ধারন করা হয়। অর্থাৎ বাগানের প্লাকিং মানকে বুঝাতে আহরিত পাতার গুনগত মান এবং আহরিত সুটের যে অংশ গাছে লেগে থাকে তার অবস্থা উভয়টিই বিবেচনায় আনতে হবে। ফাইন এবং হার্ড প্লাকিং-কেউ স্ট্যান্ডার্ড অব প্লাকিং বুঝানো হয়। ফাইন প্লাকিং এ চায়ের গুনগতমান বজায় থাকে, অন্যদিকে হার্ড প্লাকিং ক্রিপ হাইট নিয়ন্ত্রণ এবং জেনারেশন সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। নির্দিষ্ট বিরতিতে অর্থাৎ প্লাকিং রাউন্ড সঠিকভাবে অনুসরণ করা প্লাকিং এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্লাকিং করতে বিলম্ব হলে ডগা শক্ত হওয়ার পাশাপাশি জেনারেশন সংখ্যা কমে যায়। এতে প্লাকিং করা সুটের গুনগতমান খারাপ হয় শ্রমিকের দক্ষতা হ্রাস পায়, উৎপাদন কমে যায় এবং খরচ বৃদ্ধি পায়। এ জন্য প্লাকিং রাউন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্লাকিং রাউন্ড বলতে যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পাতা উত্তোলন করা হয় তাকেই বুঝায়। মৌসুমের শুরুতে এবং শেষের দিকে ইহা ১০ থেকে ১৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে, কেননা এই সময়ে সুটের বৃদ্ধি মনথর হয়ে যায়। পিক সিজনে (করা মৌসুম) সাত দিনের রাউন্ড মেইনটেইন করলে আহরিত পাতার পরিমান ও মান উভই বজায় থাকে। ফ্যাক্টরীতে নিয়মিতভাবে উন্নত মানের কাঁচা পাতা সরবরাহ এবং বাগানে শ্রমিকদের সুষ্ঠু কর্ম-বন্টনে প্লাকিং রাউন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের দেশে চা শিল্পে ধীরে ধীরে শ্রমিক সংকট দেখা দিচ্ছে এবং এই সংকট মোকাবেলায় তথা ভবিস্যত চা শিল্পকে টিকে রাখতে চা পাতা চয়নে যান্ত্রিকতার দিকে যাওয়া সময়ের দাবী বলা যেতে পারে। চয়নকৃত চা পাতার উপর তৈরিকৃত চা'র মান ও গুনাগুণ বহুলাংশে নির্ভরশীল। চা পাতা চয়নে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক পদ্ধতি কিরুপ প্রভাব ফেলতে পারে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের কৃষিতত্ত্ব বিভাগ বিভিন্ন ধরণের প্লাকিং ডিভাইস/যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষণ কাজ চালানো হয়েছে, যেমন-১জন শ্রমিক চালিত প্লাকিং মেশিন, ২ জন শ্রমিক চালিত প্লাকিং মেশিন ১জন শ্রমিক চালিত প্লাকিং শেয়ার দ্বারা।

উপরোক্ত যান্ত্রিক পাতা চয়ন পদ্ধতিগুলোর সাথে প্রচলিত হস্ত-চয়ন পদ্ধতি তুলনার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত হতে দেখা যায় যে, পিক পিরিয়ডে তথা চা পাতা উৎপাদনের ভরা মৌসুমে ২ জন শ্রমিক চালিত প্লাকিং মেশিনের সাহায্যে দিনে প্রায় ২০০ কেজি এবং ১ জন শ্রমিক চালিত প্লাকিং মেশিনের সাহায্যে প্রায় ১৫০ কেজি পাতা চয়ন করা যায় যাহা পুরুষ শ্রমিক দ্বারাই করা হয়। কিন্তু এই প্রকার যান্ত্রিক পাতা চয়ন পদ্ধতির সমস্যা হল, চয়নের পর চা গাছে কোন বাচ্চা কুঁড়ি অবশিষ্ট থাকেনা। একবার এ ধরনের মেশিন প্লাকিং-এ পাতা চয়ন করলে পরবর্তি প্লাকিং রাউন্ড পেতে অন্তত ২৫ দিন অপেক্ষা

করতে হয়। তবে যেখানে প্লাকিং-এর জন্য মহিলা শ্রমিক সংকট আছে (বিশেষত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের চা আবাদ এলাকা) এবং চা পাতা চয়নের ভরা মৌসুমে চা আবাদ জমির কিছু অংশ ১জন শ্রমিক চালিত প্লাকিং মেশিনের সাহায্যে পাতা চয়ন পদ্ধতি একটি ভাল সমাধান হিসাবে বিবেচিত হতে পারে বলে বিটিআরআই-এ বিজ্ঞানীগণ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তবে যে ভাবেই প্লাকিং করা হউক না কেন তা যেন চয়িত পাতার মান ঠিক রাখে সেই সাথে চা গাছের প্লাকিং টেবিল থেকে নীচে না নামে সে বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে।

চা চাষে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব

গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য মাটির পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি হল পানি। যে গাছ যত বেশি পানি, মাটি হতে সংগ্রহ করে প্রস্বেদন পক্রিয়ায় বের করে দেয় তার বৃদ্ধি, বিকাশ এবং ফলন তত বেশি। যখনই মাটি হতে গাছে পানি সরবরাহের মাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় কমে যেতে থাকে তখন উহার বৃদ্ধি, বিকাশ ও ফলন কমতে থাকে। শুকনো মৌসুমে মাটির মধ্যে পানির পরিমাণ কমতে কমতে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যখন গাছ আর মাটি হতে পানি সংগ্রহ করতে পারেনা, তখনই গাছ মরতে শুরু করে। এ পরিস্থিতিকে উইলটিং পয়েন্ট (wilting point) বলা হয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি বা স্থিতিশীল রাখা এবং গাছকে মারা যাওয়ার হাত হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে শুকনো মৌসুমে কৃত্রিমভাবে পানি সবরাহের মাধ্যমে মাটিতে পানির পরিমান ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন এবং এই পদ্ধতিকে সেচ (Irrigation) বলা হয়।

চা-গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ভাল ফলন পাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত পানির প্রয়োজন যা শিকড়ের মাধ্যমে মাটি হতে সংগ্রহ করে কিন্তু ইহা আসে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে। আমাদের দেশে অক্টোবর মাসের পর সাধারনত বৃষ্টিপাত হয়না এবং বৃষ্টিহীন অবস্থা প্রায়শই এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। এই শুষ্ক মৌসুম তথা খরার প্রকোপ হতে চা গাছকে রক্ষার জন্য সেইসাথে গাছের উৎপাদনশীলতা ধরে রাখার জন্য সেচ প্রধান অপরিহার্য। বিশেষ করে বাচ্চা চা চারায় সেচের প্রয়োজন অধিক।

চা আবাদিতে সেচ দেওয়ার পূর্বে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় নির্ধারন করে নিতে হয়, যথা- (ক) কখন সেচ দিতে হবে, (খ) কি পরিমাণ সেচ দিতে হবে এবং (গ) কত সময় ধরে সেচ দিতে হবে। এই বিষয়গুলো নির্ধারন করে সেচের ব্যবস্থা করা হলে সেচের খরচ যেমন সীমিত রাখা যায় তেমনি গাছের পানির চাহিদা সময়মত মেটানো যায়। উপরোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণের জন্য তথা বিজ্ঞানভিত্তিক সেচ প্রদান করতে যে তথ্যগুলোর প্রয়োজন তা হল-গাছের প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ, মাটিতে বিদ্যমান প্রকৃত পানির পরিমাণ, ফিল্ড ক্যাপাসিটির চেয়ে কতটুকু পানি ঘাটতি রয়েছে, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা, ঐ গাছগুলোর শিকড়ের গভীরতা কত ইত্যাদি। দিনের বেলায় বিশেষ করে দুপুরে চা গাছের পাতা নিচের দিকে ঝুলে গেলে/হেলে পড়লে বুঝতে হবে মাটিতে গাছের জন্য সহজলভ্য পানির পারিমাণ কমে গেছে অর্থাৎ সেচ দেওয়ার সময় হয়েছে। তবে এ অবস্থা আসার পূর্বেই অভিজ্ঞতার আলোকে সেচ দিতে পারলে চা গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন ঠিক থাকবে। মাটির আর্দ্রতা/পানির ঘাটতি (moisture depletion) একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে নামতে দেওয়া ঠিক নয়, নেমে গেলে তখন ফলন হ্রাস পাবে, গাছের বৃদ্ধি-বিকাশ কমে যাবে। মাটির আর্দ্রতা মাপার

ঐ যন্ত্রের নামে টেনসিওমিটার (Tensiometer) পূর্ণ বয়স্ক চা আবাদি মাটির আদ্রতার সর্বনিম্ন টেনসন হল ০.৫ বার। খরা শুরুর প্রাথমিক পর্যায় হতে চা বাগানের বিভিন্ন সেকশনে টেনসিওমিটার ব্যবহার করলে জানা যায় কোথায় পানির ঘাটতি কতটুকু, কোথায় আগে সেচ দিতে হবে এবং কি পরিমানে সেচ দিতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন পরেনা কিন্তু অল্প বৃষ্টি হলে প্রয়োজনীয় সেচের মোট পরিমাণ হয়ে বৃষ্টি পরিমাণ বাদ দিয়ে সেচের পানি নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণায় দেখা গেছে, চা আবাদি জমিতে মাসিক সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতের প্রয়োজনীয় পরিমাণ ৫০ মিলি মিটার, এর কম হলে তখন তা সেচের মাধ্যমে পূরণ করা উত্তম। এই তথ্য হতে ওই আবাদিতে কখন সেচ দিতে হবে, কি পরিমাণ সেচ দিতে হবে তা নির্ধারণ করা যায়। এর জন্য বাগানে সঠিকভাবে বৃষ্টিপাতের হিসাব রাখা প্রয়োজন।

বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম। তাই সে মাটিতে সেচের জন্য কম পানি লাগবে, বেশি পানি দিলে তা অপচয় হবে। পানি ধারণক্ষমতা কম বিধায় সেখানে এক সেচের সময় থেকে পরবর্তী সেচের সময়কাল কম হবে অর্থাৎ ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। অন্যদিকে কাঁদা মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি থাকায় সেচের পানি বেশি লাগবে এবং এক সেচের সময় থেকে পরবর্তী সেচের সময়কাল বেড়ে যাবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যখনই সেচ দেওয়া হবে তখনই শিকড়ের গভীরতা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভেজাতে হবে।

চা আবাদিতে ছায়া গাছ ব্যবস্থাপনা

চা চাষের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা হল ২৫° সে.-এর কাছাকাছি, বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭০-৯০%-এর মধ্যে এবং সারাবছর সমভাবে বৃষ্টিপাত অধ্যুষিত উঁচু এলাকা চা'র জন্য উপযোগী। কিন্তু ভৌগলিক অবস্থানের কারনে বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ একেক ঋতুতে একেক ধরণের আবহাওয়া বিরাজ করে। দেখা যায়, গ্রীষ্মকালে কোন কোন সময় তাপমাত্রা ৪০° সে.- এর উপরে চলে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বাতাসের তাপমাত্রা ৩৫° সে,-এর উপরে গেলেই চা গাছের পাতার কোষের কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় এবং ফলন মারাত্মক হ্রাস পায়। তাই বলা হয়, চা ছায়া পছন্দকারি ফসল। ছায়াগাছের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যদি পূর্ণ সূর্যালোকের ৫০-৬০% আলো চা গাছে পতিত হয় তা সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়। চা উৎপাদনকারী অনেক দেশের উঁচু এলাকায় ছায়াগাছ তেমন প্রয়োজন হয়না বলা হলেও খুব কম (যেমন, কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ ভারতের কিছু এলাকা) কারণ সেখানে অনেক উচ্চতায় চা চাষ করা হয় (>১ কি.মি.) যার দরুন তাপমাত্রা প্রায় সবসময়ই একই থাকে এবং তা ২০° সে,-এর কাছাকাছি। কিন্তু আমাদের দেশে চা আবাদি এলাকা সমুদ্র সমতল হতে সামান্য উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ায় (<১০০ফুট) এখানে তাপমাত্রা খুব উচ্চ হয়। চা চাষের জন্য সুবিধাজনক আবহাওয়া সৃষ্টির লক্ষ্যে চা আবাদিতে সঠিক নিয়ম ছায়াগাছ রোপণ এবং ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রয়োজন। গবেষণার রিপোর্ট হতে দেখা যায়, সঠিক ছায়াগাছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রখর সূর্যালোকের দিনে চা গাছের উপর তাপমাত্রা ১০° সে.কমে রাখা যায়। ছায়াগাছ চা আবাদি এলাকার তাপমাত্রাকে কমিয়ে রাখার পাশাপাশি মাটি থেকে পানির বাষ্পীভবন হ্রাস করে এবং খরার প্রকোপ কমায়। এছাড়াও মাটির আর্দ্রতা ও জৈব পদার্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

চা আবাদিতে তিন স্তরে ছায়া ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে যথা-অস্থায়ী ছায়াগাছ (temporary shade tree) মাধ্যমিক/সাময়িক ছায়াগাছ (intermediate/ semi-permanent shade tree) ও স্থায়ী ছায়াগাছ (permanent shade tree) রোপণ এবং পরিচর্যার মাধ্যমে। জমিতে তিন প্রকার ছায়াগাছ একসাথেই লাগানো দরকার। অস্থায়ী ছায়াগাছ চা গাছে ১.৫-২ বছর ছায়া দিয়ে থাকে, সাময়িক ছায়াগাছ ৬-৭ বছর পর্যন্ত এবং স্থায়ী ছায়াগাছ দীর্ঘ দিন (২০-৩০ বছর) ছায়া দিয়ে থাকে।

অস্থায়ী ছায়াগাছ হিসাবে বগামেডুলা (Tephrosia candida) ও ক্রোটালরিয়া (Crotalaria anagyroides) ব্যবহার করা হয়। সমতল ভূমিতে প্রতি দুই লাইন চা এর অন্তর বুনতে হয় আর দক্ষিণ ও পশ্চিম টিলা বা পাহাড়ের ঢালে প্রতি চায়ের লাইনের মধ্যে অস্থায়ী ছায়াগাছের বীজ বুনতে হয়। এরা দ্রুত বর্ধনশীল বলে চা চারাকে দ্রুত ছায়া প্রদান করে থাকে। বর্ষাকালে এদেরকে প্রয়োজনমত ছাঁটাই (lopping) করে ছায়ার ঘনত্ব কমাতে হয়।

মাধ্যমিক/সাময়িক ছায়াগাছ হিসাবে আমাদের দেশের ইন্ডিগোফেরা (Indigofera teysmanii) ব্যবহার করা হয় কিন্তু চা উৎপাদনকারী অনেক দেশেই বিশেষত নিরক্ষীয় অঞ্চলে গ্লিরিসিডিইয়া (Glyricidia sepium) খুবই ভাল মানের একটি মাধ্যমিক ছায়াগাছ। ইন্ডিগোফেরার বীজ হতে উৎপাদিত চারা মূল জমিতে ৩ মিটার X৩ মিটার দূরে দূরে গর্ত করে লাগাতে হয় এবং ১.৫-২ বছরের মধ্যেই ইহা ছায়া প্রদানের উপযোগী হয়ে ওঠে। এবং তখন সঠিক ব্যবস্থাপনায় অস্থায়ী ছায়াগাছগুলোকে আবাদি হতে উঠে দিতে হয়। ষ্ট্যাম্প কাটিং-এর মাধ্যমেও এর চারা করা হয়।

চা বাগানে স্থায়ী ছায়াগাছ হিসাবে লিগুম প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে আমাদের দেশে সাধারণত অডিট (Albizzia odoratissima) লেবেক (A. lebbek) ডেরিস (Derris robusta) করই (A. procera). মলুকানা (A moluccana) ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বর্তমানে কিছু কিছু বাগানে জাতি নীম (Azadirachta indica) ও গোরা নীম (Melia azedrach) লাগানো হচ্ছে এবং এতেও ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। বীজ হতে চারা উৎপাদন করে মূল আবাদি জমিতে নির্দিষ্ট দূরত্বে গর্ত করে রোপণ করতে হয়, যেমন সমতল আবাদিতে ও টিলার পূর্ব ঢালে ৬ মিটার X৬ মিটার দূরে, টিলার দক্ষিণ ও পশ্চিম ঢালে ৪.৫ মিটার X৪.৫ মিটার দূরে এবং উত্তর ঢালে ৯ মিটার X৯মিটার দূরে দূরে স্থায়ী ছায়াগাছের চারা লাগাতে হয়। স্থায়ী চারাগাছের চারা ধীরে বাড়ে এবং চা গাছকে কার্যকরভাবে্ ছায়া দিতে ৭-৮ বছর সময় লেগে যায়। ইহা চা গাছকে প্রয়োজনীয় ছায়া প্রদানে সক্ষমতা অর্জনের পর মাধ্যমিক/সাময়িক ছায়াগাছ সরিয়ে ফেলতে হয়। এভাবে চা আবাদিতে তিন স্তরে ছায়া ব্যবস্থাপনা করতে হয়। ছায়াগাছ ব্যবস্থাপনায় যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ তা হলঃ উপযোগী ছায়া গাছের চারা উৎপাদন, সঠিকভাবে সেই চারা রোপণ এবং তা প্রতিপালন।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন

সেচ ও পানি নিষ্কাশন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞাতব্য

গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদনে পানির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গাছ মূলের সাহায্যে মাটি হতে পানি সংগ্রহ করে তা পাতা দিয়ে বের করে দেয়। ইহা গাছের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া যাকে প্রস্বেদন (Transpiration) বলা হয় (চিত্র-৭ দ্রষ্টব্য) যতি বেশি পানি পাতা দিয়ে বাহির হতে তত গাছের বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়বে।

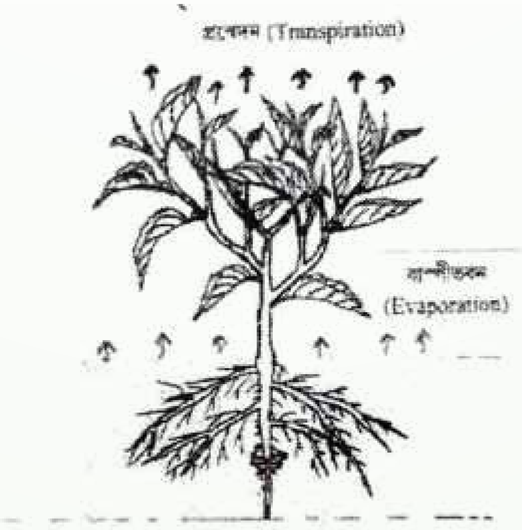

চিত্র-৭

প্রস্বেদন ও বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় মাটি হতে পানি বের হয়ে যাচ্ছে।

যখনই মাটি হতে গাছে পানি সরবরাহের মাত্রা গাছের প্রয়োজনের তুলনায় কমে যেতে শুরু করে তখনই উৎপাদনও কমতে থাকে। মাটির পানির পরিমাণ কমতে কমতে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যখন গাছ আর মাটি হতে পানি সংগ্রহ করতে পারে না, তখনই গাছ মরতে শুরু করে। এ পরিস্থিতিকে 'উইল্টিং পয়েন্ট' (Wilting point) বলা হয়। সুতরাং উৎপাদন বৃদ্ধি বা স্থিতিশীল রাখা এবং মরণ হতে রক্ষা পাবার লক্ষ্যে শুকনো মৌসুমে সেচের মাধ্যমে মাটিতে পানির পরিমাণ ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে চা অঞ্চলে বছরে ১৬৫০ হতে ৩১৪০ মি.মি বৃষ্টি হয়ে থাকে যা গাছের চাহিদার জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু এ বৃষ্টি সারাবছর সুষমভাবে না হওয়ায় শুকনো মৌসুমে পানির অভাব এবং বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা দেখা দেয়।

সেচযন্ত্র ও এর আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং সেচের নিমিত্তে পানির আধার সেচের প্রধান উপকরণ। ছোট-বড় প্রত্যেক চা বাগানের জন্য এ সমস্ত উপকরণগুলোর নিশ্চিয়তা থাকতে হবে। তাছাড়া সেচপ্রতি 'পানির

পরিমাণ’ ‘কখন’ ও ‘কত সময়ব্যাপী’ সেচ দিতে হবে সে সম্বন্ধেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যন্ত্রপাতি স্থাপনের উপরেও যথাযথ ধারণা থাকতে হবে। অন্যথায় সেচের খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং আকাংখিত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।

পানির পরিমাণঃ

প্রতি সেচের পানির পরিমাণ নিরূপণের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যাদি প্রয়োজনঃ

ক) মাটিতে প্রাপ্তিসাধ্য পানির (Avilable water) ধারণ ক্ষমতা

খ) গাছের শেকড়ের গভীরতা (Root depth)

গ) সেচের সময় মাটির প্রাপ্তিসাধ্য পানির ধারণ ক্ষমতা হতে কতটুকু কম (Soil water deficit)

ঘ) পাতা দ্বারা মাটি কতটুকু ঢাকা (Leaf coverage)

বেলেমাটির প্রাপ্তিসাধ্য পানির (Avilable water) ধারণ ক্ষমতা কম। তাই সে মাটিতে সেচের নিমিত্তে পানি কম লাগবে। বেশি পানি দিলে তা অপচয় হবে। এ ক্ষেত্রে এক সেচের সময় থেকে পরবর্তী সেচের সময়কাল কম হবে। অন্যদিকে কাঁদামাটির প্রাপ্তিসাধ্য পানির (Avilable water) ধারণ ক্ষমতা বেশি থাকায় সেচের পানি বেশি লাগবে। এ জন্য এক সেচের সময় থেকে অন্য সেচের সময়কাল বেড়ে যাবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যখনই সেচ দেয়া হবে তখনই শেকড়ের গভীরতা পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে ভেজাতে হবে। তা সহজ পর্যবেক্ষণের জন্য বাজারে প্রাপ্য কাঠমিস্ত্রির ব্যবহার্য মোটা প্যাচযুক্ত বর্মা/আগরযন্ত্র (Auger) মাটিতে ঢুকিয়ে দিয়ে বিভিন্ন গভীরতায় মাটির পানির অবস্থা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

সেচ পদ্ধতিঃ

চা বাগানের জন্য ‘স্প্রিংকলার’ (Sprinkler) সেচ পদ্ধতিই উত্তম। এর সাহায্যে জমিতে সুষমভাবে সেচের পানি সরবরাহ করা যায়। বাগানের আয়তন বা তার সুবিধার্থে ছোট বড় ‘স্প্রিংকলার’ সেট বাজারে পাওয়া যায়। যথাযথ সেচের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হবেঃ

ক) এক ‘স্প্রিংকলার’ হতে অপর ‘ ‘স্প্রিংকলার’ এর দূরত্ব এমন হতে হবে যাতে এক ‘স্প্রিংকলার’ এর পানি অন্য ‘স্প্রিংকলার’ গায়ে পরে। নিম্নে চিত্র-৮ তে ইহা দেখানো গেল।

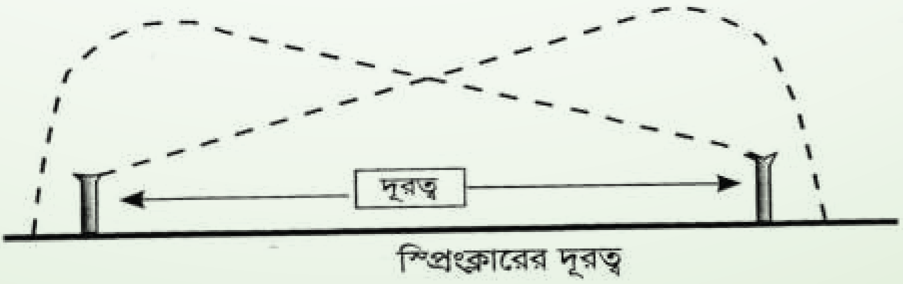

চিত্র-৮

খ) 'স্প্রিংকলার' জলচাপ (Pressure) কম বা বেশি হলে পানি সুষমভাবে বন্টন করা যাবে না। সেজন্য 'স্প্রিংকলার' নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের নির্বারিত জলচাপে (Pressure) চালাতে হবে। তবে সে জন্য 'স্প্রিংকলার' হতে বিচ্ছুরিত পানির স্ফুলিঙ্গের (Jet) আকার দেখে 'স্প্রিংকলার' এর জলচাপ অনেকটা বুঝা যায়।

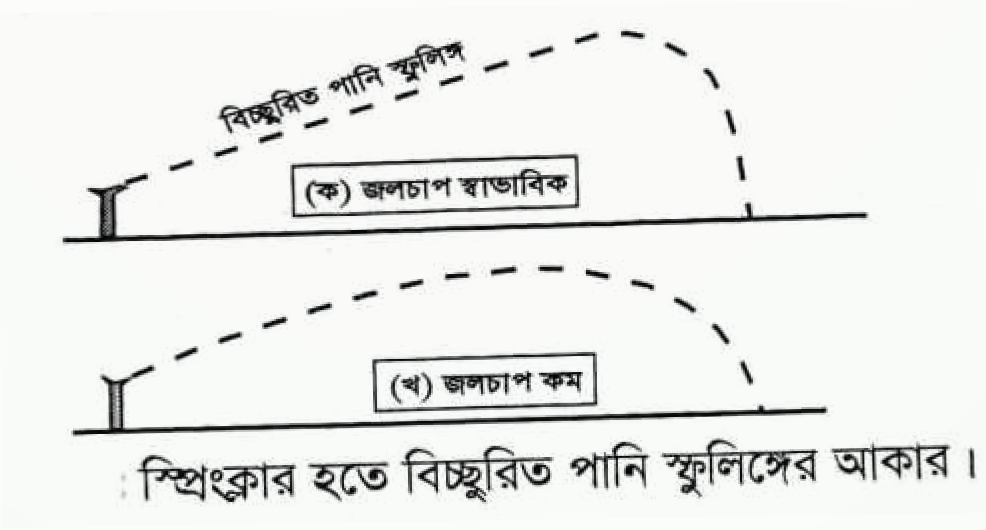

চিত্র-৯

গ) 'স্প্রিংকলার' হতে পানি সরবরাহের মাত্রা (Discharging capacity) ঐ মাটিতে পানি শোষণ ক্ষমতার বেশি হবে না। যদি হয় তবে পানির অপচয় বেশি হবে।

কখন সেচ দিতে হবে:

দিনের বেলায় বিশেষ করে দুপুরে গাছের পাতা যদি নিচের দিতে অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে পড়ে তখনই বুঝতে হবে মাটির প্রাপ্তিসাধ্য পানির পরিমাণ কমে গেছে। অর্থাৎ সেচ দেবার যথার্থ সময় হয়েছে। তবে এ অবস্থায় আসার পূর্বেই সেচ দিতে পারলে বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যাহত হবে না।

নার্সারি সেচ:

নার্সারি সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নার্সারি সেচ কাজে সাধারণত ঝাঁজরীই বেশি ব্যবহার হয়ে থাকে। অগ্রভাগ ছিদ্র বিশিষ্ট রাবার পাইপও ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই পানি সরবরাহের ছিদ্র সরু হতে হবে যাতে পানি খুব সূক্ষ ফোটায় বের হয়ে আসে। এখানেও উল্লেখ্য যে, প্রাইমারি বেডের মাটি কমপক্ষে ২ ইঞ্চি ও সেকেন্ডারি বেডে স্থাপিত চারার ব্যাগের তলা পর্যন্ত ভিজতে হবে। নার্সরির গাছ সবসময় সতেজ রাখেতে হবে। সে জন্য মাটি যাতে মোটামুটি সবসময় ভেজা থাকে সে দিকে লক্ষ্য রেখেই সেচের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিত্র-১০

পানি নিষ্কাশন

বর্ষাকালে অতিবৃষ্টির জন্য জলবদ্ধতা দেখা দেয় বিশেষ করে সমতল নিম্নভূমিতে। চা গাছের সজীবতা রক্ষা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত জলবদ্ধতা দূর করা অত্যাবশ্যক। সে জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অনুসরণ করে জমিতে নালাখনন করতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয়ঃ

ক) জমির ভেতর ছোট নালার (Lateral Drain) অবস্থান, দূরত্ব, আকার, গঠন ও তলদেশের ঢাল (Gradient)।

খ) প্রধান নালার (Main drain) অর্থাৎ ছোট নালাগুলোর পানি যে নালায় পড়বে তার অবস্থান, আকার গঠন ও তলদেশের ঢাল (Gradient)।

গ) পানির সর্বশেষ নির্গমনের (Outfall) অবস্থান ও প্রধান নালাহতে দূরত্ব।

বিশেষভাবে করণীয় বিষয়ঃ

ক) চারা রোপণের পূর্বে অর্থাৎ জমি প্রস্তুতের সময়েই নালাখনন করতে হবে।

খ) ছোট নালার পানি যাতে প্রধান নালায় এবং প্রধান নালার পানি যাতে সর্বশেষ নির্গমনে (Outfall) সহজে চলে যেতে পারে সে জন্য ছোট তলদেশ হতে প্রধান নালার তলদেশ নিচু হতে হবে। অনুরূপভাবে প্রধান নালাহতে সর্বশেষ নির্গমপথ নিচু হতে হবে। এ জন্য তলদেশের ঢাল (Gradient) ০.১০-০.২৫% পর্যন্ত হয়ে থাকে। এখানে ছোট নালার তলদেশের ঢাল অপেক্ষাকৃত বড় হবে। (ঢাল ০.২৫% বলতে বুঝায় প্রতি ১০০ ফুট বা মিটার পর নালার তলদেশ ক্রমান্নয়ে ০.২৫ ফুট বা মিটার নিচে নেমে আসবে)।

চিত্র-১১

নালার ক্রমানিম্নগামী তলদেশ

গ) নালা পরিষ্কার ও সংস্কারের কাজটি যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে। এ কাজ করতে গিয়ে যে মাটি বের হবে তা নালার পাড়ে না রেখে জমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

নালার দূরত্ব

এখানে নালার দূরত্ব বলতে এক ছোট নালার (Lateral Drain) হতে অপর ছোট নালার দূরত্বকেই বুঝানো হয়। এ দূরত্ব সাধারণত ১০-১৮ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। বালিসমৃদ্ধ মাটির ক্ষেত্রে নালার দূরত্ব বেশি এবং কাদাসসৃদ্ধ মাটির জন্য দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হবে।

নালার গভীরতা

ভি (V) আকারের হতে হবে।

নালার আকার

নালার গভীরতা শেকড়ের গভীরতার উপর নির্ভর করে। চা গাছের শেকড়ের গভীরতা সাধারণত ১ মিটার হয়ে থাকে। তাই নালার গভীরতাও ১ মিটার হওয়াই উচিত। সে অনুপাতে (অর্থাৎ ঢালর ঠিক রাখার জন্য) প্রধান নালার গভীরতা বেশি হবে।

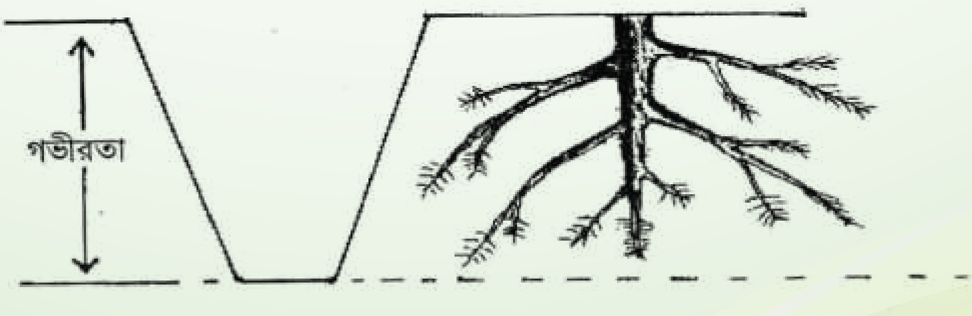

চিত্র-১২ (নালার আকার ও গভীরতা)

নালার অবস্থানঃ

জমির প্রাকৃতিক ঢাল, ভূমির বন্ধুরতা ও খননের সুবিধার উপরই নালার অবস্থান প্রধানত নির্ভরশীল। প্রধান নালা যদি বাঁকা করার প্রয়োজন হয় তা ক্রমপর্যায়ে বাঁকা করতে হবে।

চা আবাদীতে সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা

স্প্রিংক্লার সেচ   চা আবাদীতে একটি আদর্শ নর্দমা

চিত্র-১৩

চা মৃত্তিকার পুষ্টি, জৈব ও অজৈব সার ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকা নমুনা সংগ্রহের কৌশল

মাটি হচ্ছে প্রাকৃতিক পদার্থ যার উপর উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। একজন চা ব্যবস্থাপক হিসাবে কি ধরনের মাটিতে চা উৎপন্ন হয় তা জানা প্রয়োজন । চায়ের অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করণের জন্য মাটির ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুনাগুণ উন্নত করে তা রক্ষা করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক পরিবেশের তারতম্য ও শিলার গঠন অনুসারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গুনাগুণের মাটির উৎপত্তি হয়ে থাকে। বিভিন্ন মাটির বৈশিষ্ট অনুসারে বিভিন্ন উদ্ভিদ জন্মে। উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে যে সকল স্থানের তাপমাত্রা ২০-৩০ ডিগ্রীর মধ্যে এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০০-৬০০০ মিমি এর মধ্যে সে সকল স্থানে চা ভাল হয়। চা উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত প্রয়োজন তবে বৃষ্টির পানি চা গাছের গোড়ায় জমা থাকতে পারবে না। জলাবদ্ধতা চা চাষের পরিপন্থী। চা চাষের উপযোগী মাটির ভৌত ও রাসায়নিক গুনাগুণ নিম্মে দেয়া গেল।

মাটির বুনট	ঃ বেলে দোঁয়াশ
এসিডিটি (P^H)	ঃ ৪.৫-৫.৫
জৈব পদার্থ	ঃ ১% এর ওপরে
নাইট্রোজেন	ঃ ০.১ এর ওপরে।
প্রাপ্তি যোগ্য ফসফরাস	ঃ ১০ পিপি এম

প্রাপ্তি যোগ্য পটাসিয়াম	ঃ ৮০ পিপি এম
প্রাপ্তি যোগ্য ক্যালসিয়াম	ঃ ৯০ পিপি এম
প্রাপ্তি যোগ্য ম্যাগনিসিয়াম	ঃ ৩০ পিপি এম
প্রাপ্তি যোগ্য জিংক	ঃ ১ পিপি এম
প্রাপ্তি যোগ্য বোরণ	ঃ ১ পিপি এম

চা চারা রোপনের পূর্বে মাটির গুনাগুণ সঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

চা বাগানকে খরা হতে রক্ষার উপায়:

যদি কোন বৎসর বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম হয় বা বৃষ্টিপাত দ্রুত বন্ধ হয়ে যায় তবে তার পরের বৎসর অথবা যদি কোন বৎসর বৃষ্টিপাত দেরীতে শুরু হয় তবে সে বৎসর খরা দেখা দেয়। যে সকল ব্যবস্থা নিলে চা গাছকে খরা হতে রক্ষা করা যায় তা হল, চারা রোপনের সময় মেডুলা বা ক্রোটলেরিয়ার বীজ বপন, পর্যাপ্ত ছায়া গাছ রোপন, মাল্চ বা জৈব পদার্থ প্রয়োগ, প্রয়োজনীয় নালা খনন ও জল সেচ করতে হবে। এছাড়া খরা সহিষ্ণু চা চারা রোপন করতে হবে।

জলসেচ:

মাটিতে রস কমে গেলে যখন চা গাছের পাতা ঝিমিয়ে পরে তখনই জলসেচ করতে হয়। প্রয়োজনীয় প্রতিবার জল সেচের সময় মাটিতে যে গভীরতায় শিকড় আছে সে গভীরতা পর্যন্ত মাটিকে ভিজিয়ে দিতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক চা চারায় বাঁশ বা প্লাস্টিক চুঙ্গির সাহায্যে জলসেচ করা হলে বেশী কার্যকরী ও খরচ কম হবে।

ড্রেনেজ:

সেকশন হতে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে ড্রেনেজ পদ্ধতি বলা হয়। জলাবদ্ধতা হলে চা গাছের শিকড় পচে যায়। গাছ পর্যাপ্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না ফলে গাছ মরে যায়। তাই চা চারা রোপনের পূর্বেই জমি প্রস্তুতের সময় ড্রেন করে নিতে হবে। বর্ষার সময় নালা পরিস্কার রাখতে হবে। নালা ইংরেজী ভি আকৃতির করতে হবে কমপক্ষে ৩ ফুট গভীর হতে হবে।

জলাবদ্ধতার লক্ষণ:

· চা চারার বৃদ্ধি ভাল হয় না।

· বাগানে শূন্যস্থান হয়।

· গাছের ডালা শুকিয়ে যায়।

· উৎপাদন কম হয়।

· ফাঙ্গাস আক্রমণ করে।

· অনুজীবের কার্যকারিতা কমে যায়।

· গাছে ডালের সংখ্যা কম হয়।

· পাতা হলুদ হয়ে যায়।

· পাতা ঝরে যায়।

· প্রুনিংয়ের পর ডাল বা শ্যুট আসে না।

· রেড রাষ্ট রোগে ধরে।

· গাছের সতেজতা কমে যায়।

· সার প্রয়োগের পর তা কার্যকরী কম হয়।

সার প্রয়োগ সুপারিশমালা

নার্সারীতে সার প্রয়োগ সুপারিশমালা:

- প্রাথমিক বেডে প্রতি বর্গ মিটারে ১৫০ গ্রাম টি এস পি
- সেকেন্ডারী বেডে প্রতি ঘন মিটারে ৩০০-৩৫০ গ্রাম টি এস পি ১৫০-২০০ গ্রাম ডলোমাইট
- শেড সরানোর পর রোপনের জন্য রেডি চারা ২% ইউরিয়া ও এম ও পি
- গোবর পানির মিশ্রণঃ গোবর পানির অনুপাত ১ঃ৪ ভাল করে পাত্রে মিশিয়ে ২-৩ সপ্তাহ রেখে পঁচাতে হবে (স্টক সলিউসন)। মোটা ছিদ্রযুক্ত ছাকনি দিয়ে ছাকতে হবে। স্টক সলিউশন পূনরায় পানির সাথে ১ঃ৪ অনুপাতে মিশ্রণ তৈরী করে ১৫ দিন অন্তর ২ বার প্রয়োগ করা গেলে চারার বৃদ্ধি ভাল হবে।
- ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এম ও পি ১৫ লিটার পানিতে মিশ্রণ তৈরী করে ১০০০ চারায় ঝাজরির সাহায্যে প্রয়োগ করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়।

চারা রোপনের সময় সার প্রয়োগঃ

- প্রতি চারার গর্তে ৩০ গ্রাম টি এস পি
- ২-৩ কেজি গোবর

নিউক্লিয়াস ক্লোন প্লটে সার প্রয়োগঃ

- ২ঃ১ঃ২ অনুপাতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাস দুই বার প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বাড়িতে সার প্রয়োগঃ

প্রতি চারায় মাটির পিএইচ অনুযায়ী ডলোমাইট প্রয়োগ করতে হবে (রাসায়নিক সার প্রয়োগের কমপক্ষে ১৫ দিন আগে অথবা পরে)। খৈল গুড়া করে ডলোমাইট ও গোবর একত্রে রিং করে কেনোপি অনুযায়ী চর্তুদিকে দিতে হবে।

টেবিল-৩

চারার বয়স	গোবর (কেজি)/ প্রতি গাছ	খৈল (কেজি)/ প্রতি গাছ	SOA (গ্রাম) / প্রতি গাছ	টি এস পি (গ্রাম) / প্রতি গাছ	এমও পি (গ্রাম) / প্রতি গাছ
১	৫	০.৫	১০০	৫০	৫০
২	৫	০.৫	২০০	১০০	১০০
৩	১০	১.০	৩০০	৩০০	৩০০
৪	১০	১.০	৪০০	৪০০	৪০০
৫ এর উপরে	১০	১.০	৫০০	৫০০	৫০০

ছায়াতরুর জন্য সার প্রয়োগ সুপারিশমালা:

গোবর/কম্পোস্ট	ঃ ১০-১৫ কেজি
খৈল	ঃ ১-২ কেজি
টিএসপি	ঃ ২০০ গ্রাম
ডলোমাইট	ঃ ১ কেজি
কাঠের ছাই	ঃ ২-২.৫ কেজি

প্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছে সার প্রয়োগ সুপারিশমালা

প্রথম দফাঃ (প্রতি হেক্টরে ১০০০ কেজি তৈরী চা উৎপাদন হলে)

প্রয়োগের সময়ঃ মার্চ/ এপ্রিল মাসে যখন মাটিতে পর্যাপ্ত রসের সঞ্চয় হবে।

টেবিল-৪

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি)/হেঃ
ইউরিয়া	১১০
টি এস পি	৪৪
এম ও পি	৬০

প্রতি ১০০ কেজি অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য

ইউরিয়া-১১ কেজি

টি এস পি-২ কেজি

এম ও পি-৬ কেজি

দ্বিতীয় দফা:

প্রয়োগের সময়ঃ জুলাই মাসের শেষের দিকে বা আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে।

টেবিল-৫

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি)/ হেঃ
ইউরিয়া	১৩২
এম ও পি	৬০

অপ্রাপ্ত বয়স্ক চা গাছে সার প্রয়োগ সুপারিশমালা

টেবিল-৬

চারার বয়স	সার মিশ্রণের পরিমাণ (কেজি/ হেঃ)				প্রতি গাছে প্রয়োগ মাত্রা	
	ইউরিয়া	টি এস পি	এম ও পি	মোট	রাসায়নিক (গ্রাম)	গোবর বা কম্পোস্ট
১	১৭৬	৯০	১৬০	৪২৬	৩৯	১ কেজি/চারা
২	২০০	১০০	১৮০	৪৮০	৪৪	১ কেজি/চারা
৩	২৬৫	৯০	১৬০	৫১৫	৪৭	৫ টন/ হেঃ
৪	৩০০	১০০	১৮০	৫৮০	৫৩	৫ টন/ হেঃ
৫	৩৩০	১১০	২০০	৬৪০	৬০	৫ টন/ হেঃ

উক্ত অনুপাতে সার মিশিয়ে ৩ দফায় (এক তৃতীয়াংশ করে) এপ্রিল/মে মাসে প্রথম, আগস্ট মাসে দ্বিতীয় ও অক্টোবর মাসে তৃতীয় দফা প্রয়োগ করতে হবে।

সারের কার্যকারীতা বৃদ্ধির জন্য করনীয়ঃ

- ·উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে সঠিক সার ও সঠিক পরিমান সার মিশ্রণ করতে হবে।
- সঠিক সার প্রয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
- সার প্রয়োগের সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকতে হবে।
- সার মিশ্রণ তৈরীর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাগানে প্রয়োগ করতে হবে।
- সার প্রয়োগের পূর্বে বাগান আগাছা মুক্ত করতে হবে।
- মাটির ক্ষয়রোধ করতে হবে।
- মাটির এসিডিটি সংশোধন করে নিতে হবে।
- সঠিক ভাবে ড্রেন করতে হবে যাতে জলাবদ্ধতা না হয়।
- সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সঠিক সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।
- দফা ভিত্তিক সার দিতে হবে।
- সার প্রয়োগের পূর্বে রোগ বালাই দমন করে নিতে হবে।
- পাতায় যাতে সার না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গাছের গোড়ায় মুষ্টি করে সার দেয়া যাবে না
- দুই সারি পর পর সমভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে।
- খেয়াল রাখতে হবে খালি যায়গায় বা ড্রেনে যাতে সার না পড়ে।
- ভেজালমুক্ত সার ব্যবহার করতে হবে।

জৈব সারের কাজঃ

- বৃষ্টির ফোঁটার শক্তি কমিয়ে দেয়
- মাটির ভিতরে পরিস্কার পানি প্রবেশ করে
- পানির সাহায্যে মাটির ক্ষয় কমে যায়

- বাতাসের সাহায্যে ক্ষয় কমে যায়
- মাটির গঠন উন্নত করে
- গাছের শিকড় বেশী ভিতরে ঢুকতে পারে
- মাটিতে বসবাসকারী উপকারী পোকা মাকড় ও অনুজীবকে খাদ্য সরবরাহ করে
- শীত গ্রীষ্মে মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করে
- মাটি হতে রস শুকিয়ে যেতে বাধা দেয়
- পচে গাছের খাদ্য সরবরাহ করে
- ক্ষতিকর রাসায়নিক বিক্রিয়া ও বিষাক্ততা (বিষক্রিয়া) হতে উদ্ভিদকে রক্ষা করে
- জৈব এসিড সরবরাহ করে
- গাছের খাদ্য ভান্ডার হিসাবে কাজ করে
- ফসফরাসকে প্রাপ্তি যোগ্য করে।

জৈব পদার্থ পাওয়ার উপায়ঃ

- সবুজ সার
- প্রুনিং লিটার
- খড়কুটা
- কম্পোস্ট
- মালচ
- গোবর
- কচুরিপানা
- খৈল
- হাড়ের গুড়া ইত্যাদি সহ যে কোন প্রকার উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের অবশিষ্টাংশ।

কম্পোষ্ট:

বাগানে প্রুণিং লিটার, আগাছা, কচুরীপানা ইত্যাতি দ্বারা গর্ত করে কম্পোষ্ট প্রস্তুত করা যায়। মাটিতে ১ মি: x ১ মি: x ১.৫ মি: (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) গর্ত করতে হবে। গর্তের ভিতরে প্রুণিং লিটারের পাতা, ছোট ডালা, আগাছা ইত্যাদি দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। ভরাট করার সময় ৩:২:১ অনুপাতে ইউরিয়া, এমওপি ও টিএসপি ছিটিয়ে দিতে হবে। ১ মাস পর পর গর্তের ভিতরের প্রুণিং লিটারের পাতা, ছোট ডালা, আগাছা ইত্যাদি উল্টেপাল্টে দিতে হবে। এভাবে ৩ মাস পর কম্পোষ্ট তৈরি হবে।

ভার্মি কম্পোষ্ট:

পাকা ঘর তৈরি করে ১৫ ফিট x ৪ ফিট x ১.৩ ফিট (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) ইট-সিমেন্টের বেড তৈরি করতে হবে। উক্ত বেডে কাঁচা গোবর ১০-১৫ দিন রাখার পর কলাগাছের টুকরা ও গোবর ৫০:৫০ অনুপাতে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে বেডগুলি ভর্তি করতে হবে। এরপর ১ কেজি বা ১০০০-১৫০০ কেঁচো (*Eisenia foetida)* বেডে ছেড়ে দিতে হবে। বেডগুলি যথোপযুক্ত (Optimum) ভিজা রাখার জন্য চটের বস্তা ভিজিয়ে গোবরের মাঝখান

দিয়ে বিছিয়ে রাখতে হবে। এভাবে ৪০-৫০ দিনের ভিতরে ভার্মিকম্পোষ্ট তৈরি হবে।

মাটির নমুনা সংগ্রহের কৌশল:

মাটির নমুনা হল মাটির উপাদানের সংগ্রহ যা দ্বারা মাটির পরিবর্তনশীলতা এবং সঠিক বিশ্লেসণাত্মক ফলাফল নির্ণয় করা হয় এবং এ জন্য নমুনা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। মাটির নমুনা পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ করা একটি প্রাথমিক কার্যকর উপায় যা মাটির পুষ্টির মান নির্ধারণের জন্য এবং কৃষি কাজের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মাটির নমুনা সংগ্রহের সময়:

১. মাটির pH মাত্রা এবং পুষ্টির অবস্থা নির্ণয় করার জন্য জমিতে শেষ সার প্রয়োগের নূন্যতম ৬ সপ্তাহ পরে নমুনা সংগ্রহ করা উচিত।
২. নমুনা সংগ্রহের সময় মাটি তুলনামূলকভাবে আর্দ্র হওয়া উচিত।
৩. গুরুতর খরা এবং ভারী বৃষ্টিপাতের সময় নমুনা সংগ্রহ করা উচিত নয়।

মাটির নমুনা সংগ্রহের সময় নিচের ধাপগুলো মাথায় রাখতে হবে:

১. পুরো এলাকাটির নমুনা সংগ্রহের জন্য এলাকাটিকে কয়েকটি ছোট ইউনিট (ব্লক) ভাগ করা উচিত, তবে প্রতিটি ব্লক এক হেক্টরের বেশি হওয়া উচিত নয়।

২. নমুনা সংগ্রহের আগে, উপরের মাটিতে বিঘ্ন না ঘটিয়ে অপরিচ্ছন্ন এবং আংশিকভাবে পচনশীল জৈব পদার্থ (মালচ পদার্থ) সাবধানে অপসারণ করতে হবে।

৩. অগার দিয়ে প্রতিটি স্যাম্পলিং পয়েন্ট থেকে (স্যাম্পলিং) মাটি সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি ব্লকে থেকে ৮-১০টি নমুনা সংগ্রহ করা উচিত।

৪. তিনটি ভিন্ন গভীরতা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা উচিত যেমন: ০-২৩ সেমি. ২৩-৪৬ সেমি এবং ৪৬-৯২ সেমি। নমুনা সমূহকে কাঠের ট্রেতে আলাদাভাবে রাখতে হবে।

৫. নমুনাসমূহ মিশ্রণের জন্য (কম্পোসিট সেম্পল) তৈরির জন্য নমুনাগুলিকে গভীরতা অনুযায়ী ০৩ টি আলাদা ট্রেতে পুঙখানুপুঙ্খভাবে মিশ্রিত করা উচিত। অর্থ্যাৎ ০-২৩ সেমি এর সাথে ০-২৩ সেমি, ২৩-৪৬ সেমি এর সাথে ২৩-৪৬ সেমি এবং ৪৬-৯২ সেমি এর সাথে ৪৬-৯২ সেমি এর মৃত্তিকা নমুনা মিশ্রিত করে কম্পোসিট সেম্পল তৈরি করতে হবে। তারপর প্রতিনিধি নমুনা বিটিআরআইতে প্রেরণের জন্য প্রায় ৫০০ গ্রাম মাটি পেকেট করে সংগ্রহ করতে হবে।

৬. শুধুমাত্র নার্সারি স্থাপনের জন্য ০-২৩ সেমি পর্যন্ত মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে হয়। নার্সারি সাইটের নমুনার জন্য, নমুনা সংগ্রহের আগে মাটি শুকিয়ে গেলে আর্দ্র করতে হবে।

৭. নমুনা (প্রায় ৫০০ গ্রাম মাটি) সিল করা পলিথিন টিউবে সংগ্রহ করতে হবে। তারপরে এটি অন্য পলিথিন ব্যাগে স্থাপন করতে হবে এবং যে কোনও প্রকার ক্ষতি (লেবেল নষ্ট) হওয়া এড়াতে উপরের ব্যাগের মধ্যে একটি লেবেল স্থাপন করতে হবে।

লেবেলে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকতে হবে:

১. চা বাগানের নাম

২. মাটি সংগ্রহের তারিখ

৩. অবস্থান (এলাকা, ব্লক, সেকশন নং)

৪. গভীরতা (সেমি/ইঞ্চি)

৫. গভীরতা (সেমি/ইঞ্চি)

৬. টপোগ্রাফি

৭. মাটির নমুনা নং

৮. স্যাম্পলিং এর উদ্দেশ্য

৯. কালেক্টরের নাম

সর্বশেষ সুপারিশমালা:

- যত বেশী সম্ভব মাটিতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করে মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করুন
- সুষম সার প্রয়োগ করুন
- সুষম সারে চা গাছে রোগ বালাই কম হয়
- সুষম সারে চায়ের গুনগত মান বৃদ্ধি করে
- সুষম সারে চায়ের উৎপাদন বাড়ে

চা আবাদীতে চায়ের রোগ ও আগাছা দমন ব্যবস্থাপনা

চায়ের রোগের ধারনা:

একটি গাছকে তখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক বলা চলে যখন সাধারণ অবস্থায় গাছের পূর্ণ বিকশিত হওয়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে অর্থাৎ গাছটি স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে পারে। এ কাজগুলো সর্বদাই পারিস্পারিক অবস্থার সাথে সমতা রক্ষা করে চলে। এই সমতার বিঘ্ন ঘটলেই রোগের সৃষ্টি হয়। সাধারনত কোন জীবানুর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আক্রমনের ফলে অতীব পরিবেশগত কারনে যখন চা গাছের কোষ-কলাসমূহের ক্ষতি সাধন হয়, শারীরবৃত্তীয় নানা কাজ বাধাগ্রস্থ হয়, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয় বা অস্বাভাবিক লক্ষণ প্রকাশিত হয় তখন তাকে চা গাছের রোগ বলে। রোগের কারনে অনেক সময় চা গাছ মারা যায়।

সমস্ত গাছপালা রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক কিংবা চারা অবস্থায়ও চা গাছে বিভিন্ন রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। সাধারণত শৈবাল ও ছত্রাক জাতীয় জীবানু দ্বারা চা গাছের রোগসমূহ সংঘটিত হয়ে থাকে। চায়ের এসব রোগসমূহ কোন কোন সময় স্বল্প পরিসরে আবার অনেক সময় ব্যাপক পরিসরে আক্রমন করে থাকে এবং চায়ের ফলনের প্রভূত ক্ষতি সাধন থাকে। পোকা-মাকড়ের মত রোগের জীবানুসমূহকে খালি চোখে দেখা যায়; বিধায় সাধারণত এদের গুরুত্ব কম দেখা হয় এবং এদের দ্বারা ক্ষতিকর অবস্থাও নিরূপন করা হয় না। তবে সঠিক জ্ঞান ও পদ্ধতি জানা থাকলে প্রতিটি রোগের আলামত (Symptom) দেখে এদের চিহ্নিত করা যায়। সঠিকভাবে আক্রান্ত রোগটি চিহ্নিত করতে পারলে তা দমন করা সহজ হয় এবং এদের ক্ষতি থেকে গাছকে বাঁচানো যায় তথা ফসলহানী থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় কেবলমাত্র রোগের কারণে প্রায় ১০-১৫% ফলন কমে যায়। যথাসময়ে ও সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সম্পূর্ণ ফলনও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশের চায়ের ২২টি জীবানুঘটিত রোগ ছত্রাক ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বছরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রোগবালাইয়ের আক্রমনের তীব্রতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এদের প্রাদুর্ভাব বাগান থেকে বাগান, সেকশন থেকে সকশনে ভিন্নতর হতে পারে।

চা গাছের রোগের প্রকারভেদ:

১. সংক্রামক রোগ: রোগের জীবানু, যেমন ছত্রাক, ব্যকটেরিয়া, ভাইরাস, শৈবাল ইত্যাদি দ্বারা রোগ সংঘটিত হয়। এসব রোগ এক গাছ থেকে অন্য গাছে বিস্তারলাভ করতে পারে।

২. অসংক্রামক রোগ: রোগের জীবানু ছাড়াই পরিবেশগত কারনে যেমন খরা, জলাবদ্ধতা, মাটিতে পুষ্টিপাদানের অভাব, হার্ড প্যান ইত্যাদির কারনে রোগ সংঘটিত হয়ে থাকে। এসব রোগ এক গাছ থেকে অন্য গাছে বিস্তারলাভ করতে পারে না। সংক্রামক রোগের জীবানুসমূহ সাধারনত পানি, বাতাস, বৃষ্টির ছিটা-ফোটা পানি, নালার পানি, শ্রমিকদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা কাপড়, সেকশনে অবাধ গরু ছাগলের বিচরণ প্রকৃতির মাধ্যমে বিস্তারলাভ করে।

চা গাছের রোগের তালিকা:

সাধারনত বিভিন্ন রোগজীবানু গাছের বিভিন্ন অঙ্গ আক্রমন করে থাকে। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুতে যে সমস্ত রোগজীবানু চা গাছের গোড়া থেকে কচি কিশলয় পর্যন্ত বিভিন্ন অঙ্গ আক্রমন করে রোগ সৃষ্টি করে থাকে তাদেরকে গাছের অবস্থানভেদে তিনভাগে ভাগ করে বিভিন্ন অংশের প্রধান প্রধান রোগবালাই সমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে উল্লেখ করা হলো:

টেবিল-৭

(ক) পাতায় ও গাছের অগ্রভাগের রোগসমূহ:	(খ) গাছের মধ্যভাগের রোগসমূহ:	(গ) গাছের গোড়া বা নিম্নভাগের রোগসমূহ:
১. পল বা পুটি রোগ ২. ডাইব্যাক বা আগামরা রোগ ৩. ব্ল্যাক রট বা পাতা পঁচা রোগ ৪. গ্রে/ব্রাউন বা পাতা ঝলসানো রোগ ৫. রিন্টার রাই বা ফোঁসকা রোগ ৬. এসিফাইটিক রেড রাস্ট রোগ	১. রেড রাস্ট বা লাল মরিচা রোগ (প্যারাসাইটিক) ২. ব্রাঞ্চ ক্যাঙ্কার বা ক্ষত রোগ ৩. হর্স হেয়ার ব্লাইট ৪. গ্রে ব্লাইট রোগ ইত্যাদি	১. কলার রট ২. চারকোল স্ট্যাম্প রট ৩. ভায়োলেট রুট রট ৪. পারপল রুট রট ইত্যাদি

নিম্নে প্রধান প্রধান রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করা হলো।

(১) ডাইব্যাক বা আগামরা রোগ (Dioback disease):

রোগের লক্ষণ:

১. এ রোগের আক্রমনে প্রথমে কচি ডগায় ছোট ছোট বাদামী দাগ পড়ে।

২. আস্তে আস্তে দাগগুলো ক্রমশ বড় হতে থাকে ও হলুদাভ হয়।

৩. পরবর্তীতে এই দাগগুলো আক্রমনের স্থান থেকে উপর ও নিচে উভয় দিতে বর্ধিত হতে থাকে এবং ধূসর বাদামী বা কালো রং ধারন করে।

৪. এই কালো দাগ ক্রমশ আক্রান্ত ডালের নিচের দিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাড়ন্ত মুকুল (auxillary bud) প্রস্ফুটিত হতে পারে না। ফলে তা পাতাসহ ডালপালা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে মারা যায়।

৫. গাছের বা ডালের আগা হতে গোড়ার দিকে আক্রান্ত ডালপালা ক্রমশ মারা যায় বিধায় এ রোগকে ডাইব্যাক বা আগামরা রোগ বলে।

প্রতিকার:

১. অল্প পরিসরে আক্রমনের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অংশের সামান্য নিচ পর্যন্ত ধারালো ঢাকু দ্বারা কেটে অপসারণ করতে হয়। অত:পর প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে কপার অক্সিক্লোরাইড গ্রুপের ছত্রাকনাশক (যেমন-সানভিট ৫০ ডব্লিউলি বা সালফক্স ৫০) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২. ব্যাপক পরিসরে আক্রমনের ক্ষেত্রে ১৫ দিন পরপর ২ বার Knowin 50 WP বা অন্য যেকোন অনুমোদিত Carbendaim 50 WP প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ গ্রাম হারে অথবা Propiconazole 25 EC বা Hexaconaole 5 EC প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ মিলি হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(২)চায়ের লাল মরিচা রোগ (Red Rust Disease)

রোগের লক্ষণ:

১. সাধারণত এক বছরের অধিক বয়স্ক ডালে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। একটি শাখা বা এর যে কোন অংশ একবার আক্রান্ত হলে ছত্রাক সুপ্তাবস্থায় একবছর পর্যন্ত সতেজ থাকতে পারে।

২. পরবর্তী বছর বৃষ্টির উপর নির্ভর করে ছত্রাক ফ্রুটিংবডি সৃষ্টি করে থাকে। যখন ছত্রাক ফ্রুটিংবডি সৃষ্টি করে, তখন আক্রান্ত অংশটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

৩. রোগাক্রান্ত ডাল বা কান্ডর উপর লাল/কমলা রং চুলের মত অংগানু সৃষ্টি হয়। এসব অংগানুসমূহ একত্রিত হয়ে আক্রান্ত এলাকায় লাল মরিচার মত দেখতে বিধায় একে লাল মরিচা রোগ বা রেড রাস্ট বলা হয়।

৪. আক্রান্ত কান্ডের পাতাগুলো হলুদ-সবুজের ছোপ ছোট (variegated leaf) অবস্থায় প্রকাশ পায়। পাতায় হলুদ-সবুজের অবস্থা (variegated) দেখলেই প্রাথমিক ভাবে বোঝা যায় লাল মরিচা রোগের লক্ষণ। এরূপ হওয়ার কারন হল রেড রাস্ট আক্রান্ত চা গাছ জাইলেম দিয়ে গাছের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পাতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। অপরদিকে পাতা ও পর্যাপ্ত খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তাই পাতায় হলুদ-সবুজ ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়।

প্রতিকার:

১. আক্রান্ত এলাকায় অনুমোদিত মাত্রায় সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে।

২. ছায়াগাছবিহীন স্থানে প্রয়োজনীয় পরিমাণে ছায়া গাছ রোপণ করতে হবে।

৩. সেকশনে জলাবদ্ধতা দূর করার নিমিত্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা ব্যবস্থা উন্নত ও পরিষ্কার করতে হবে।

৪. মাটির সংস্পর্শে থাকা বাজে ডালপাল অপসারণ করে গাছ পরিষ্কার রাখতে হবে।

৫. বগামেডুলা নামক অস্থায়ী ছায়া গাছ এ রোগের অন্যতম পোষক বিধায় দুবছর বয়সের পূর্বেই বগামেডুলা চা আবাদি হতে কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৬. রোগাক্রান্ত এলাকায় বছরের মার্চ-এপ্রিল মাসে ১ম/২য় বৃষ্টিপাতের পর হেক্টর প্রতি ২.৮ কেজি হারে হারে কপার অক্সিক্লোরাইড জাতীয় ছত্রাকনাশক অথবা ২ কেজি হারে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের কান্ড ও শাখা প্রশাখায় ভালভাবে সিঞ্চন করতে হবে। সফলভাবে এ রোগ দমনার্থে ১৫ দিন অন্তর আরোও ২ বার ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৭. বছরে অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ১৫ দিন পরপর ২ বার Knowin 50 WP বা অন্য যেকোন অনুমোদিত Carbendaim 50 WP প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ গ্রাম হারে অথবা Propiconazole 25EC / Hexaconaole 5 EC প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ মিলি হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(৩) চায়ের এপিফাইটিক রেডরাস্ট/লিফ রাস্ট রোগ (Leaf rust disease):

রোগের লক্ষণ:

১. প্রথমে পাতার উপরিভাগে ছোট ছোট মরিচা রোগের ন্যায় দাগ পড়ে।

২. দাগগুলি প্রথমে ধূসর সবুজ রং বিশিষ্ট হয়ে থাকে, তবে পরবর্তীতে লালচে বাদামী রং ধারণ করে।

৩. দাগগুলো ক্রমশ: বড় হতে থাকে এবং গোল আকার ধারণ করে।

৪. দাগগুলি সামান্য উচু হয়ে থাকে এবং দাগের মধ্যে অবস্থিত ছত্রাক দেহ অনেকটা মখমলের মত কোমল মনে হয়; ছত্রাক পাতার উপরিতল ভেদ করে ভিতরের অন্তত্বকে করে এবং পরভোজীর মত পাতা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে।

৫. পাতার আক্রান্ত অংশের কোষগুলো মরে যায়।

৬. প্রচুর পরিমাণ লাল মরিচা দাগে পাতা আবৃত হলে সালোক-সংশ্লেষণে অসুবিধা হয় এতে গাছ দূর্বল হয়ে পড়ে এবং ফলন কম হয়।

৭. লাল মরিচা দাগ পত্রদন্ড, কচি ডাল ও কান্ডেও দেখা যায়।

রোগের প্রতিকার:

১. প্রুনিং এর সময় গাছের মরা ডাল ও মাটির সংস্পর্শে থাকা অনুৎপাদনশীল বান্‌জি ডাল অপসারন করে নিতে হবে। মাটির সংস্পর্শে থাকা অনুৎপাদনশীল বান্‌জি ডাল চা গাছের প্যারাসাইট হিসেবে কাজ করে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগের বিশেষ করে লিফ রাস্ট (এপিফাইটিক রেড ব্লাস্ট) রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে।

২. চা বাগানের ভিতর বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়াতরুর ব্যবস্থা করে এই রোগ অনেকটা দমন করা যায়।

৪. রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।

৫. প্রুনিং পরবর্তী চা গাছের পরিস্কার করার পর প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৫৬০ গ্রাম Copper Oxychloride 50WP/WG বা ৪৫০ গ্রাম Copper hydroxide বা ৪০০ গ্রাম হারে Mancozeb 40 WP প্রয়োগ করতে হবে।

৬. এরপর বছরের শুরুতে ১ম/২য় বৃষ্টির পর প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৪০০ গ্রাম হারে Mancozeb 80 WP বা একই হারে Antrocol/Learneb 70 WP দ্বারা সাধারন স্প্রে প্রয়োগ করতে হবে।

হর্স হেয়ার ব্লাইট রোগ (Horse hair blight disease)

রোগের লক্ষণ:

১. সাধারণ বছরের জুন থেকে আগস্ট মাসে যখন উষ্ণ, আর্দ্র ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া বিরাজ করে তখন এ রোগের জীবানু বেশ সক্রিয় হয়ে উঠে।

২. এ জীবানুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি কোন স্পোর উৎপন্ন করে না। এ রোগের লক্ষণ সনাক্ত করা বেশ কঠিন, তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে আক্রান্ত চা গাছগুলো খুব দূর্বল এবং সতেজহীন মনে হয়।

৩. খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করলে আক্রান্ত চা গাছের উপর আক্রমনকারী ছত্রাকের উজ্জল কালো বর্গের সূত্রক বা কর্ভ দেখা যায়। যেহেতু ছত্রাকের এই সূত্রকগুলোকে একত্রে হর্স হেয়ারের মত দেখায় তাই এই রোগের জীবানু দ্বারা সৃষ্ট রোগকে হর্স হেয়ার ব্লাইট রোগ বলা হয়ে থাকে।

৪. ছত্রাকের এই সূত্রক বা কর্তগুলো আক্রান্ত চা গাছের কাঠামোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডালপালাকে জালের মত জড়িয়ে ফেলে। ফলে আক্রান্ত গাছের সক্রিয় সালোকসংশ্লেষণ হ্রাস পায়।

দমন ব্যবস্থা:

১. চা আবাদিতে বিশেষকরে কুনচি এলাকায় অপ্রয়োজনয়ি ছায়াতরু অপসারন করতে হবে।

২. সমতল এলাকায় ছায়াতরু সম্পূর্ণ অপসারন না করে অপ্রয়োজনীয় ডালাপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।

৩. মাটির সম্পর্কে থাকা অনুৎপাদনশীল বাঞ্জি ডালা ছেঁটে অপসারণ করতে হবে।

৪. প্রুনিং এর সময় মরা, রোগাক্রান্ত ডালাপালা অপসারন করতে হবে। ফলে আক্রামনের উৎসও কমে যাবে।

৫. সেকশনের যেখানে এ রোগের আক্রমনের তীব্রতা বেশি সেখানে নিচু ছাটাই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। অতপর প্রুনিং লিটারসমূহ ভালোভাবে অপসারণ করতে হবে এবং পরিত্যক্ত ডালপালাসমূহ অপসারণ ও বিনষ্ট করতে হবে।

৬. পানি নিষ্কাশনের জন্য সেকশনের নালাসমূহ গভীর ও সংস্কার করতে হবে।

৭. প্রুনিং এর পর চা গাছের যথাযথ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা করা অপরিহার্য। প্রুনিং এর পর রোগের জীবানু ও আক্রান্ত অংশ, গাছের সাথে ঝুলে থাকা অবশিষ্টাংশ হাতবাছাই করে অপসারন করতে হবে। অত:পর যতদ্রুত সম্ভব (২৪ ঘন্টার মধ্যেই) প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৫৬০ গ্রাম Copper Oxychloride 50 WP/WG বা ৪৫০ গ্রাম Copper hydroxide বা ৪০০ গ্রাম হারে Mancozeb 80 WP মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৮. বছরের শুরুতে ১ম/২য় বৃষ্টির পর প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৪০০ গ্রাম হারে Mancozeb 80 WP বা একই হারে Antracol/ Larneb 70 WP দ্বারা ৭ দিন পরপর ২ বার সাধারন স্প্রে প্রয়োগ করতে হবে। মধ্য জুলাই থেকে আগস্ট মাস সময়ে আক্রান্ত এলাকায় ১৫ দিন পরপর ২ বার Knowin 50 WP বা অন্য যেকোন অনুমোদিত Carbendaim 50 WP প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ গ্রাম হারে অথবা Select Plus 35 SC বা Amistar top 32.5 SC প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ মিলি হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

(৪) চায়ের ব্লাক রট রোগ (Black rot disease):

রোগের লক্ষণ:

১. সাধারনত পাতা চয়ন টেবিলের নিচের মেনটেইনেন্স পাতাসমূহ এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

২. এ রোগের কারনে পাতাগুলো প্রথমে হালকা বাদামী রং ধারন করে এবং ক্রমশ রং পরিবর্তীত হয়ে কালো হতে থাকে। পাতার মাঝের অংশ এ কিনারা ধুসর বাদামিতে পরিনত হয় যা ভেজা অবস্থায় কালো দেখায়।

৩. আক্রান্ত পাতার নিচে সাদা সূত্রাকার ছত্রাক বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আক্রান্ত ধূসর পাতা ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম দ্বারা অন্য পাতা বা কান্ডের সাথে একত্রিত অবস্থায় থাকে কিম্বা ঝুলে থাকে। এটাই এ রোগ সনাক্ত করনের বিশেষ লক্ষণ।

৪. আক্রান্ত গাছের পাতা থেকে এই রোগের ছত্রাকের স্পোর পাতার সম্পর্শে আসলে বা বায়ুর মাধ্যমে অন্য গাছে বিস্তার করে এবং সেই গাছকে আক্রমন করে।

দমন ব্যবস্থা: হর্স হেয়ার ব্লাইট রোগের দমন ব্যবস্থার মতই।

(৫) চায়ের ব্রাঞ্চ ক্যাঙ্কার রোগ (Branch canker disease):

রোগের লক্ষণ:

১. এ রোগ কান্ডের বা গাছের গোড়ার আক্রান্ত স্থানে এক বিশেষ ধরনের ক্ষতের বৃষ্টি হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে যে রোগের লক্ষণ সহজে সনাক্ত করা যায় না।

২. বর্ষা মৌসুমের প্রারম্ভে অপরিনত গাছের কান্ডের বাকলের উপর সুক্ষ ডিম্বাকৃতি ও সামান্য গভিরতা বিশিষ্ট ক্ষত স্থানটি গোলাকার ক্যালাস বেষ্টিত থাকে।

৩. ক্যাম্বিয়ামের মধ্যে ছত্রাকের মাইসেলিয়ামের বৃদ্ধির কারনে উহা কান্ডের বাকল এবং কাষ্ঠ মধ্যবর্তী অঞ্চলে খুব দ্রুত বিস্তারলাভ করে। আক্রান্ত স্থানের বাকল ক্রমশ: শুকিয়ে যায় এবং ঈষৎ কালো বর্ণ ধারণ করে এবং ঝড়ে পড়ে।

৪. কান্ডের উপরে এই কালে দাগ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হওয়ার পূর্বেই মৃত স্থানের কিনারা হতে ক্যালাস সৃষ্টি হয়ে কান্ড পুনরায় স্বাভাবিক দৃষ্ট হতে শুরু করে। মরা বাকলের কালো অংশ ঝরে পড়ার পরই নিচের সাদা কাঠ দেখা যায় এবং রোগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায়।

দমন পদ্ধতি:

১. অধিক বালুকাময় স্থানে চা রোপন পরিহার করা শ্রেয়।

২. খরার সময় বাগানে অপরিনত চা আবাদিতে পুরু মালচ প্রয়োগ করতে হেব।

৩. প্রখর সূর্যালোকের ফলে বাকলের ঝলসানি বা ফাঁটল এড়াতে বাগানের সেকশনের যেসমস্ত এলাকায় ছায়াতরুর অপ্রতুলতা বিদ্যমান সেসব জায়গায় প্রয়োজনানুসারে স্থায়ী ও অস্থায়ী ছায়াতরু জন্মাতে হবে।

৪. সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, নালা সংস্কার, শাখা-প্রশাখা বৃদ্ধির জন্য সঠিক ছাটাই পদ্ধতি অনুসরণ, মরা ডালাপালা অপসারন করতে হবে।

৫. রোগাক্রান্ত অপসারিত ডালসমুহ হতে যেহেতু রোগের বিস্তার ঘটতে পারে যেহেতু এগুলো সংগ্রহপূর্বক বিনষ্ট করতে হবে।

৬. যেসমস্ত কান্ডের উপরের অংশে রোগের তীব্র আক্রমন পরিলক্ষিত হবে, সেক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানের ৫ সেমি নিচ থেকেই সুস্থ ডালেরও কিয়দংশসহ ছেঁটে অপসারনের পর কাটা স্থানে কপার ছত্রাকনাশকের পেস্ট তৈরী করে প্রলেপ দিতে হবে।

৭. শিলায় ক্ষতিগ্রস্থ চা এলাকায় ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই স্পর্শক ছত্রাকনাশক যেমন Copper Oxychloride 50 WP/WG প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৫৬০ গ্রাম বা Copper hydroxide 77 WP ৪৫০ গ্রাম বা Mancozeb 80 WP ৪০০ গ্রাম হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে্

৮. তীব্র খরার পরপরই সেকশনে স্পর্শক ছত্রাকনাশক যেমন Copper Oxychloride 50 WP/WG প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৫৬০ গ্রাম বা Copper hydroxide 77 WP ৪৫০ গ্রাম বা Mancozeb 80 WP ৪০০ গ্রাম হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

৯. ১ মাস পরপর ২ বার ট্রাইকোডার্মা পাউডার প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৪০০ গ্রাম হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

গোড়া পঁচা রোগ (Collar rot disease):

রোগের লক্ষণ:

১. চায়ের এ রোগ সৃষ্টিকারী জীবানুটি গাছের কলার অংশে বা গোড়ায় সৃষ্টি ক্ষত স্থান দিয়ে আক্রমণ করে।

২. গাছের গোড়ার ক্ষতস্থানের বাকল উঠে যায় কিম্বা চিকন হয়ে যায়।

৩. আক্রমণস্থল থেকে ১/২ ইঞ্চি উপরে এবং ১/২ ইঞ্চি নিচে প্রসারিত হয়ে এর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

৪. আক্রান্ত স্থানটি গোলাকার ক্যালাস বেস্টিত থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আক্রান্ত অঞ্চলটি পেন্সিলের আকৃতির মত হয়ে যায়।

৫. আক্রান্ত স্থানের ভাস্কুলার সিস্টেম নষ্ট হয়ে যায় ফলে মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণে এবং পাতায় উৎপাদিত খাদ্য পরিবহনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় গাছ ক্রমশ দূর্বল হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে মারা যায়।

প্রতিকার:

১. গাছের গোড়া থেকে কমপক্ষে ২-৩ ইঞ্চি দূরে মালচিং বা সার প্রয়োগ করা উচিত যাতে মালচিং বা সার থেকে সৃষ্টি ভাল গাছের গোড়াকে ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে।

২. প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে চারাপাশের এ সারি সুস্থ গাছসহ আক্রান্ত এলাকার চারদিকে ৩০ সেমি চওড়া এবং ৩০ সেমি গভীরাত বিশিষ্ট গর্ত করে অস্থায়ী নালা তৈরী করে গাছগুলোকে পৃথকীকরণ করে পরবর্তীতে চিকিসৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. পৃথককৃত এলাকায় মাটি কোদাল দ্বারা কুপিয়ে ভালোভাবে ওলট-পালট করতে হবে। অতপর প্রতি গাছ প্রতি ১০০-২০০ গ্রাম হারে ডলোমাইট ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৪. ডলোমাইট প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পর সেখানকার মাটি পুনরায় কুপিয়ে ভালো ভাবে ওলট-পালট করতে হবে। অতপর ০.২% ফরমালিন দ্রবন (৪৫০ লিটার পানিতে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিনের ৯০০ মিলি মিশিয়ে) প্রয়োগ করার পর মাল্চ দিয়ে রাখতে হবে। বাজারে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে ১৫ দিন পর পর ২ বার Knowin 50 WP বা অন্য যেকোন অনুমোদিত Carbendaim 50 WP প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ গ্রাম হারে অথবা Propiconazole 25

EC / Hexaconaole 5 EC প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ মিলি হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করার পর মাল্‌চ দিয়ে রাখতে হবে।

৫. ডলোমাইট প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পর সেখানকার মাটি পুনরায় কুপিয়ে ভালোভাবে ওলট-পালট করার পর উল্লেখিত রাসায়নিক ক্যামিকেল প্রয়োগ না করে; ১ মাস পরপর ২ বার ট্রাইফোডার্মঅ পাউডার প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৪০০ গ্রাম হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৬) চারকোল গোঁড়া পঁচা রোগ (Charcoal stump rot disease):

রোগের লক্ষণ:

১. রোগাক্রান্ত গাছ এককভাবে অথবা একই জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি গাছ হঠাৎ করে মারা যায়।

২. আক্রান্ত গাছের পাতাগুলো শুরুতে হালকা হলুদাভ হয়ে ঝিমিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে ঝলসে যায়।

৩. বাদামী-লাল রং এর ঝলসানো পাতাগুলো কিছুদিন ডালে লেগে থাকে এবং ডালা নাড়া দিলেও পাতাগুলো ঝড়ে পড়ে যায় না।

৪. প্রাথমিক অবস্থায় পাতাগুলো শ্লথ/পিছল হয় এবং ক্রমশ পাতার সজীবতা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় শিকড়ের উপর ছত্রাকের স্পোর পরিলক্ষিত হবার পূর্বেই গাছ মরে যেতে দেখা যায়।

৫. গাছের শিকড়ের উপরিভাগে বিশেষ করে গোড়ার এলাকায় ছত্রাকের সাদা বর্গের ফ্রুটিং বডিস দেখা যায় এবং পরবর্তীতে কয়লার ন্যায় শক্ত আবরনের সৃষ্টি হয়।

৬. আক্রমন তীব্র হলে শিকড়ের বাকল উৎপাটনের পর ছত্রাকের মাইসেলিয়াস দেখা যায়।

দমন পদ্ধতি:

১. রোগের প্রাথিমিক লক্ষণ সনাক্ত করে রোগাক্রান্ত গাছ চিহ্নিত করতে হবে।

২. সম্পূর্ণ মৃত গাছ শিকড় ও পার্শ শিকড়সহ সেকশন থেকে তুলে ফেলতে হবে। অত:পর সেখানকার মাটি কুপিয়ে ওলট-পালট করে দিতে হবে।

৩. চা চারা রোপনের পূর্বে আক্রমণের উৎস এড়াতে মরা জংলী গাছ, ছায়াতরুর শিকড় অবশ্যই অপসারন করতে হবে।

৪. গাছে রোগের আক্রমনের শুরুতেই অর্থাৎ আক্রমনের চিহ্ন দেখা যাওয়া মাত্রই প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ এবং এর আশেপাশের ২/১টি সুস্থ গাছ নিয়ে তার চারপাশে ৩০ সেমি (১ ফুট) চওড়া এবং ৯০ সেমি (৩ ফুট) গভীর করে অস্থায়ী নালা তৈরী করতে হবে যাতে আক্রান্ত গাছের এলাকা ও সুস্থ গাছের এলাকার মধ্যে শিকড়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

৫. পৃথককৃত এলাকার মাটি কোদাল দ্বারা কুপিয়ে ভালোভাবে ওলট-পালট করতে হবে। অতপর গাছ প্রতি ১০০-০০ গ্রাম হারে ডলোমাইট ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৬. ডলোমাইট প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পর সেখানকার মাটি পুনরায় কুপিয়ে ভালোভাবে ওলট-পালট করতে হবে। অতপর ০.২% ফরমালিন দ্রবন (৪৫০ লিটার পানিতে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিনের ৯০০ মিলি মিশিয়ে) প্রয়োগ করার পর মাল্‌চ দিয়ে রাখতে হবে। বাজারে ৪০% বাণিজ্যিক ফরমালিন পাওয়া না গেলে সেক্ষেত্রে ১৫ দিন পরপর ২ বার Knowin 50 WP বা অন্য যেকোন অনুমোদিত Carbendaim 50 WP প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ গ্রাম হারে অথবা Propiconazole 25 EC Hexaconaole 5 EC প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ১৫০ মিলি হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করার পর মাল্‌চ দিয়ে রাখতে হবে।

৭. ডলোমাইট প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পর সেখানকার মাটি পুনরায় কুপিয়ে ভালোভাবে ওলট-পালট করার পর উল্লেখিত রাসায়নিক ক্যামিকেল প্রয়োগ না করে; ১ মাস পরপর ২ বার ট্রাইকোডার্মা পাউডার প্রতি ২০০ লিটার পানিতে ৪০০ গ্রাম হারে মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সাধারণত চায়ের রোগবালাই দমনার্থে ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন গ্রুপের ছত্রাকনাশক ও তাদের প্রয়োগমাত্রা:

টেবিল-৮

ছত্রাকনাশক গ্রুপের নাম	ছত্রাকনাশকের নাম	হেক্টর প্রতি প্রয়োগমাত্রা	২০০ লি পানিতে (১ ড্রামে)	হেক্টর প্রতি পানির পরিমাণ
কপার অক্সিক্লোরাইড	এমিডিটর ৫০ ডব্লিউ পি.	১০০০ লিটার পানিতে ২.৮ কেজি	৫৬০ গ্রাম	২০০ লিটার ধান ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ ড্রাম
	লোরাইড ৫০ ডব্লিউ পি			
	অক্সিকব ৫০ ডব্লিউ পি			
কার্বেডাজিম	নোইন ৫০ ডব্লিউ পি এগ্রিডাজিম ৫০ ডব্লিউ পি এমডিাজিম ৫০ ডব্লিউ পি	১০০০ লিটার পানিতে ৭৫০ গ্রাম	১৫০ গ্রাম	২০০ লিটার ধান ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ ড্রাম

ম্যানকোজেব	বডেজ ৫০ ডব্লিউ পি রেকাজেব ৮০ ডব্লিউ পি	১০০০ লিটার পানিতে ২ কেজি	৪০০ গ্রাম	২০০ লিটার ধান ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ ড্রাম
প্রপিনেব	এন্টাকল ৭০ ডব্লিউ পি	১০০০ লিটার পানিতে ২ কেজি	৪০০ গ্রাম	-
	লারনেব ৭০ ডব্লিউ পি			
এজোক্সিস্ট্রাবিন+ ডাইফেনোকোনাজল	এমিস্টারটপ ৩২.৫ এসপি	১০০০ লিটার পানিতে ৭৫০ মিলি	১৫০ মিলি	২০০ লিটার ধান ক্ষমতা সম্পন্ন ৫ ড্রাম
	টগস্টার ৩২.৫ এসপি			
এজোক্সিস্ট্রাবিন+ টেবুকোনাজল	সিলেক্টপ্লাস ৩৫ এসসি	১০০০ লিটার পানিতে ৭৫০ মিলি	১৫০ মিলি	-
	উল্কা ৩৫ এসিসি			
টেবুকোনাজল+ ট্রাইফ্লোক্সিস্ট্রবিন	ব্লাস্টিন ৭৫ ডব্লিউজি	৫০০ গ্রাম	১০০ গ্রাম	
	প্রপেল ৭৫ ডব্লিউজি			

চায়ের প্রধান প্রধান আগাছাসমূহ ও প্রতিকার

ফসল উৎপাদনে একটি বড় অন্তরায় বা আপদ হিসেবে কৃষির সূচনা থেকেই আগাছা কৃষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যে সকল আপদ ফসলের ফলন ও গুনগতমান কমিয়ে দেয় তাদের মধ্যে আগাছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। Bendixen (১৯৭২) এর মতে বিভিন্ন রোগ বা কীট পতঙ্গের চেয়েও আগাছা বেশী ক্ষতিকর।
"স্বতঃস্ফুত ও যথেচ্ছাভাবে জন্মানো অবাঞ্ছিত এমনকি প্রতিকূল পরিবেশ পর্যাপ্ত বংশ বিস্তার ও বৃদ্ধি ক্ষমতা সম্পন্ন ও উত্তম পুষ্টি সংগ্রহকারী প্রতিযোগী বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদকে আগাছা বলে।"

আগাছার বিস্তার

ফসল উৎপাদনের জন্মলগ্ন থেকেই কৃষক ফসলের মাঠ থেকে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তবুও দেখা যায় প্রতিটি মৌসুমেই মাঠে নতুন করে গাছাছা বিস্তার লাভ করে। এক জমি থেকে অন্য জমিতে, এক সেকশন থেকে অন্য সেকশনে এমনকি এক দেশ থেকে অন্য দেশে আগাছা বীজের বিস্তার ঘটে তা জানা আবশ্যক। বিভিন্ন মাধ্যমেই সাহায্যে আগাছার যৌন/অযৌন বীজ বিস্তার লাভ করতে পারে। যেমন বায়ু প্রবাহ, পানি প্রবাহ, জৈব সার, প্রাণী, মাটি, কৃষি যন্ত্রপাতি, যান্ত্রিক বিস্তার ইত্যাদি।

আগাছার ক্ষতিকর প্রভাব

(ক) ফসল হানী

আগাছা বিভিন্ন ফসলে ফসলহানী ঘটিয়ে থাকে।

১. Ashiq and Cheema (২০০৫) অনুসারে পাকিস্তানে গমের ৩০% ফসল হানী ঘটায়।
২. Halila (১৯৯৫) মতে খেসারীর ফলন শতকরা ৬০ ভাগ কমিয়ে দেয়।
৩. (Rao et. al, 1977) মতে টোকাসাইতে চায়েল ফলন ১০-৫০ ভাগ কম হয়।
৪. Sana (১৯৮৯) আগাছার প্রাদুর্ভাবের কারনে মতে শ্রীলঙ্কাতে ৯%, দক্ষিণ ভারতে ৯-১২% এবং বাংলাদেশে ৯-১২% চায়ের ফলন কম হয় (১২-১৫%)।

(খ) অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাবঃ

১. আগাছা প্রধান ফসলের সাথে ভালো, পানি, পুষ্টি ও স্থানের জন্য প্রতিযোগীতা করে। এক জরিপে দেখা গেছে ৬০ দিনে আগাছার প্রতিযোগীতায় ৭২% নাইট্রোজেন, ২৫% ফসফরাস এবং ৩৬% পটাশিয়াম মাটি থেকে অপচয় হয়।
২. বিভিন্ন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থল/পোষক হিসেবে কাজ করে।
৩. বিভিন্ন কৃষিজ কাজ যেমন-প্রুনিং, প্লাকিং, সার প্রয়োগ প্রভৃতি কাজে বিঘ্ন ঘটায়।
৪. গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তারে বাধাদান করে।
৫. পাতা চয়নের হার কমিয়ে দেয়।
৬. গুনগতমান কমিয়ে দেয়।
৭. নালার মধ্যে দিয়ে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাষণে বাধা প্রদান করে ফলে সেকশনে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়।
৮. ফসলের উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়।
৯. জমির উর্বরতা মান কমিয়ে দেয়।
১০. জন স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

আগাছা ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) প্রতিরোধকরণঃ কোন স্থানে আগাছার বীজ, বংশবিস্তারকারী অন্যান্য অংগ এমনকি পূর্ণাঙ্গ গাছের অনুপ্রবেশ/বিস্তার রোগের মাধ্যমে আগাছা ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে প্রতিরোধকরণ বলে।

(খ) উচ্ছেদ/নির্মূল/দূরীকরণঃ উচ্ছেদকরণ বলতে কোন স্থানে আগাছার বীজ, বংশবিস্তারকারী অন্যান্য অংশ এমনকি পূর্ণাঙ্গ গাছ এমনভাবে ধ্বংস করাকে বুঝায় যাতে নতুন করে আগাছার বীজ বিস্তার লাভ না করলে ঐ স্থানে আর আগাছা জন্মাবে না।

(গ) নিয়ন্ত্রণঃ যে পদ্ধতিতে আগাছায় আক্রান্ত কোন জমির আগাছাকে কেবল অর্থনৈতিক ক্ষতিকর পর্যায়ের নিচে নামানো হয়, কিন্তু পূর্ণরূপে বিনষ্ট করা হয় না তাকে আগাছার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বরে।

আগাছা প্রতিরোধকরণঃ কোন স্থানে আগাছার বীজ, বংশবিস্তারকারী অন্যান্য অংশ এমনকি পূর্ণাঙ্গ অনুপ্রবেশ/বিস্তার রোগের মাধ্যমে আগাছা ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে প্রতিরোধকরণ বলে।

১. আগাছার উচ্চতা ১০-১৫ সেমি. হওয়ার পূর্বেই আগাছা দমন।

২. চা আবাদীর আশেপাশে বা নিকটস্থ চতুর্দিকের, রাস্তার পাশে, গলি পথ আগাছামুক্ত রাখা।

৩. অনাবাদী বা উন্মুক্ত জায়গায় কভার ক্রপ লাগানো।

৪. বছরের শুরুতেই সকল সেকশনে আগাছা দমনের পূর্ব পরিকল্পনা করা।

৫. কম্পোষ্ট বা মালচিং এর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা যাতে-আগাছার বীজ বা রিজেনারেটিং অংশ না থাকে।

আগাছা নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিঃ

(ক) পরিচর্যা পদ্ধতিঃ মালচিং, কভার ক্রপ, ইনফিলিং ইত্যাদি।

(খ) যান্ত্রিক পদ্ধতিঃ হাত দিয়ে টেনে তুলে ফেলা, চিলিং, সিকলিং, আচড়া দেয়া ইত্যাদি।

(গ) জৈবিক পদ্ধতিঃ ভক্ষনকারী জীব, রোগের জীবানু এবং পরজীবি দ্বারা।

(ঘ) রাসায়নিক পদ্ধতিঃ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করে দমন পদ্ধতি।

বাংলাদেশে চা আবাদীতে যে সকল আগাছাসমূহ জন্মে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ এবং সুবিধার্থে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। নরম ও অকাষ্টল গুলোকে এক-বীজপত্রী এবং শক্ত ও কাষ্টলগুলোকে দ্বি-বীজপত্রী আগাছা হিসাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। চা আবাদীতে কোন কোন সেকশনে এক-বীজপত্রী এবং শক্ত ও কাষ্টলগুলোকে দ্বি-বীজপত্রী আগাছা হিসাবে ভাগ করা হয়ে থাকে। চা আবাদতে কোন কোন সেকশনে এক-বীজপত্রী এবং কোন কোন সেকশনে দ্বি-বীজপত্রী আগাছা জন্মিয়ে থাকে। আবার কোন কোন সেকশনে এক-বীজপত্রী ও দ্বি-বীজপত্রী উভয় প্রকার আগাছা জন্মিয়ে থাকে। কিন্তু আগাছা নাশক আছে শুধুমাত্র এক-বীজপত্রী জাতীয় আগাছাকে দমন করে কিন্তু দ্বি-বীজপত্রী আগাছার উপর কাজ করে না। অন্যদিতে কিছু আগাছা নাশক আছে শুধুমাত্র দ্বি-বীজপত্রী জাতীয় আগাছাকে দমন করে কিন্তু এক-বীজপত্রী আগাছার উপর কাজ করে না। আবার কিছু আগাছা নাশক আছে এক-বীজপত্রী ও দ্বি-বীজপত্রী উভয় জাতীয় আগাছাকে দমন করে থাকে। সব আগাছা নাশক সব আগাছা উপর কাজ করে না বিধায় আগাছা নাশক দ্বারা আগাছা দমন করতে গেলে সেকশনের আগাছার ধরণ তথা কোন জাতীয় আগাছা বিদ্যমান তা দেখে আগাছা নাশক ব্যবহার করা উচিত। অন্যদিকে নার্সারীতে আগাছাসমূহ দমন করে দু'ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা যা। (১) স্ট্যান্ডিং নার্সারীতে হাত বাছাই করে এবং (২) নার্সারীর বেডে (চারা লাগানোর পূর্বে) প্রি-ইমার্জেন্ট জাতীয় আগাছা নাশক প্রয়োগ করে।

একবীজপত্রী আগাছাসমূহ: দূর্বা ঘাস, ছল ঘাস, মুথা ঘাস, আঙ্গুলী ঘাস ইত্যাদি।

দ্বি-বীজপত্রী আগাছাসমূহ: বাগরাকোট, মিকানিয়ালতা, নিশি, লজ্জাবতী, ঘেটু, কুকুর শুঙ্গা, ছোট দূধীয়া, বড় দুধীয়া, কলফা সন্ধা, বিষকাঠালী, বন পটল, তেলা কুচি, শ্বেতদ্রোন, থানকুনী ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ব্যবহৃত আগাছানাশক ও এদের হেক্টর প্রতি মাত্রা:

টেবিল-৯

Group	Trade Name	Dose/ha
Glyphosate	Roundup 41 SL, Ridweed 41 SL, Edround 41 SL, Linphosate 48 SL, Bairound 41% SL. etc	3.5 Litre mixed in 750 litre of water. (933 ml/200L)
Paraquat	Gramoxone 20 W/W, Pillaroxone 20, Paraxone 20, Weedoxone 20% SL etc	2.8 Liter mixed in 750 litre of water. (746 ml/200L)
2, 4- D Amine Salt	Clear 48, 2, 4-D weeder 72, Kem Amine 48, 2, 4-D ect	2.8 Liter mixed in 750 litre of water. (746 ml/200L)
Glufosinate Ammonium	Fasinate 20 SL	3.0 Liter mixed in 750 Liter of water. (800 ml/200 L)
Glyphosate+MCPA	Rapid 40.5 SL. Fullshot 40.5 SL	2.0 Liter mixed in 750 liter of water (533 ml/200 L)
Glyphosate+ Carfentrazone ethyl	Trigger 36. 5	2.0 Liter mixed in 750 litre of water (533 ml/200 L)
Bispyribac Na+ Bensulfuran Methyl	Relt 30 WP, Forend 30 WP	2.5 kg mixed in 750 liter of water (666 ml/200L)

আগাছা দমন সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরমর্শঃ

১. যে কোন ঔষধ অবশ্যই রেজিস্টার্ড ডিলার হতে ক্রয় করা উচিত।
২. ষ্টোরে পৃথক পৃথক ঔষধ লেবেল লাগিয়ে আলাদাভাবে রাখা উচিত।
৩. আগাছানাশকসমূহ অবশ্যই পৃথক ষ্টোরে রাখা উচিত।
৪. প্রচন্ড বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সময় ঔষধ সিঞ্চন করা উচিত নয়।
৫. পাউডার জাতীয় ঔষধ প্রথমে অল্প পানিতে গুলিয়ে নিলে ভাল।
৬. আগাছা অবশ্যই ফুল ফোটার আগে দমন করা উচিত।
৭. নির্ধারিত মাত্রার কমে বা বেশীতে আগে দমন করা উচিত।
৮. দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দ্বারা ঔষধ সিঞ্চন করানো উচিত।
৯. আগাছানাশক সব সময় আলাদা চিহ্নিত মেসিন দ্বারা সিঞ্চন করা উচিত।

চায়ের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও এদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

চা বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল ও রপ্তানী পণ্য। চা গাছ একটি বহুবর্ষজীবি উদ্ভিদ। চা গাছ বহুবর্ষজীবি ও একক চাষকৃত উদ্ভিদ হওয়ায় পোকামাকড়ের জন্য স্থায়ী গৌন আবহাওয়া ও তাদের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য সরবরাহের একটি অন্যতম উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করে। চা উৎপাদনের যেসব অন্তরায় রয়েছে তাদের মধ্যে চায়ের ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় ও কৃমিপোকা অন্যতম। বাংলাদেশ চায়ে এখন পর্যন্ত ২৫ প্রজাতির পতঙ্গ, ৪ প্রজাতির মাকড় ও ১২ প্রজাতির কৃমিপোকা সনাক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে আবাদী এলকায় চায়ের মশা, উঁইপোকা ও লালমাকড় এবং নার্সারী ও অপরিণত চা আবাদীতে এফিড জেসিড থ্রিপস, ফ্লাসওয়ার্ম ও কৃমিপোকা মূখ্য ক্ষতিকারক কীট হিসেবে পরিচিত। অনিস্টকারী এসব পোকামাকড় বছরে গড়ে প্রায় ১০-১৫% ক্ষতি করে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১০০% ক্ষতির সম্মুখীন হয়। নিম্নে চায়ের এসব ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের পরিচিত ও তাদের সমন্বিত দমন ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো।

পোকামাকড় পরিচিতি ও দমন কৌশলঃ

চায়ের মশা

চায়ের কোমলপাতা ও কুঁড়িতেই এদের আক্রমন সীমিত। এরা পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতার উপর এক বা একাধিক বাদামী রং ছোট ছোট ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়। আক্রমনের তীব্রতাভেদে একটি মশা ২৮-৭২টি পর্যন্ত শোষণ-ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষতের চারদিক ২৪ ঘন্টার মধ্যেই কালো হয়ে যায়। শস্য মৌসুমে আক্রমণ তীব্র হয়। ব্যপক আক্রমণে নতুন কিশলয় গজানো বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি ডগার কান্ড বা পাতার বোটা ফেটে যায়। গাছের উপরের অংশ প্রায় কালো ও বিবর্ণ হয়ে যায়। আক্রান্ত স্থানের নীচে কাকের

পায়ের মত নতুন ডাল-পালা গজায়। সাধারণতঃ এপ্রিল/মে এবং আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসে আক্রমণ বেড়ে যায়। বাংলাদেশে চায়ের মশার কারণে ১০-১৫% শস্য ক্ষতি হয়ে থাকে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- অধিক ছায়াযুক্ত এলাকায় ছায়াতবু ছাটাই করে সেকশনে পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা।
- কুঞ্চি বা স্যাঁতসেতে এলাকায় পানি নিষ্কাশন করে বাতাসের আর্দ্রতা কমান।
- চা আবাদীর পাশে মিকানিয়া লতা ও জঙ্গল পরিষ্কার রাখা। কারন শীত মৌসুমে এর এখানে আশ্রয় নেয়।
- সেকশন আগাছা মুক্ত রাখা।
- পাতা চয়ন ৭ দিন নিশ্চিত করা। এতে মশার বংশবিস্তার রোধ হবে ও মশার অধিকাংশ ডিম ধ্বংস হবে।
- মশা আক্রান্ত প্রবণ এলাকায় ত্রিবার্ষিক ছাঁটাই চক্র অনুসরণ করা।
- সাধারণত বীজ জাত কোন জাত হতে কিছুটা মশা প্রতিরোধী।
- প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি. হারে বেটা সাইপারমেথ্রিন ৫ ইসি অথবা ১ মিলি, ডেল্টামেথ্রিন ২.৫ ইসি অথবা ০.৫ মিলি, এসিটামিপ্রিড ২০ এসপি, অথবা ০.৫ মিলি, ইমিডাক্লোপ্রিড ২০এসএল অথবা ০.৬ মিলি, ডিনোটিফুরান ২০ বিউএসজি প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্রঃ ১৪ঃ পূর্ণ বয়স্ক মশা, মশা আক্রান্ত চা শ্যূট (প্রাইমারী ধাপ) ও মশা আক্রান্ত চা শ্যূট (সেকেন্ডারী ধাপ)

বেরিয়ার স্প্রে পদ্ধতিঃ

কীটনাশক নিক্রনের ক্ষেত্রে বেরিয়ার পদ্ধতি অনুসরন করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে প্রথমে আক্রান্ত এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। এরপর ঐ এলাকার চারিদিকে ৮-১০ সারি গাছে কীটনাশক স্প্রে করতে হবে। তারপর বাইরের দিক থেকে স্প্রে করতে করতে ভিতরে প্রবেশ করতে হবে।

টেবিল-১০

সর্বোচ্চ ডিম পাড়ার ক্ষমতা (জুন-সেপ্টেম্বর)	৪০০-৬০০টি
সর্বনিম্ন ডিম পাড়ার ক্ষমতা (নভেম্বর-মে)	৪০-২৮০টি
২৪ ঘন্টার মধ্যে ডিম পাড়ে	৪-১০টি
ডিম ফুটে বাচ্চা দেয়ার সর্বোচ্চ সময়কাল (নভেম্বর-মার্চ)	২৩-৩৪ দিন
ডিম ফুটে বাচ্চা দেয়ার সর্বনিম্ন সময়কাল (এপ্রিল-অক্টোবর)	৫-১২ দিন
সর্বোচ্চ জীবন চক্রের ব্যাপ্তি (নভেম্বর-মার্চ)	২২-৫৭ দিন
সর্বনিম্ন জীবন চক্রের ব্যাপ্তি (এপ্রিল-অক্টোবর)	১৫-১৯ দিন
জীবনকাল	৩৬ দিন

নিফ এবং পূর্ণাঙ্গ মশা উভয়ই নরম কান্ড, কুঁড়ি ও কচি পাতার রস শুষে খায়। তবে এদের জীবনচক্রের অপরিনত ও পরিনত দশার উপর পোষণ ক্ষতের সংখ্যার ভিন্নতা দেখা যায়।

টেবিল-১১

১ম পর্যায়ের দিক	৮৫-১০০ টি শোষণ ক্ষত
২য় পর্য়ায়েল দিক	৭৪টি শোষণ ক্ষত
৩য় পর্যায়ের দিক	২৮টি শোষণ ক্ষত
৪র্থ পর্যায়ের দিক	৭২টি শোষণ ক্ষত
পূর্ণাঙ্গ মশা	১৫০টি শোষণ ক্ষত

লালমাকড়:

আবহাওয়াগত তারতম্য বিশেষ করে গড় তাপমাত্রা ৩০°/২০° সে. এর উপরে যা কিনা লালমাকড়ের প্রজনন ক্ষমতা, ডিমের সুপ্তিকাল, জীবনকাল পরিবর্তন ও বংশবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুরুপভাবে, তাপমাত্রার সাথে আক্রমণের মাত্রা সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়, ফলে সাধারণত বছরে এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

- বর্ধিত তাপমাত্রা ও কুয়াশাচ্ছন্ন লালমাকড় বৃদ্ধির জন্য অনূকূল। হালকা বৃষ্টি বা বা থেকে থেকে রোদ লালমাকড়ের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়ে দেয়।

- লালমাকড় প্রবণ এলাকার পর্যাপ্ত ছায়াগাছ রোপন করতে করে। কেননা লালমাকড় উষ্ক ও শুষ্ক আবহাওয়া পছন্দ করে।
- আগাছা লালমাকড়ের বিকল্প পোষক। তাই প্রথম বৃষ্টিপাতের পর আগাছা যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে সেদিকে নজর দিতে হবে।
- দমকা বাতাসে লালমাকড় ছড়ায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সাধারণত দমকা বাতাস হয়ে থাকে। ফলে আক্রান্ত সেকশন হতে লালমাকড় ভালো সেকশনে ছড়ানোর সম্ভবনা রয়েছে। সেবিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- বছরের শুরুতে ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে স্কিফ ও নতুন আবাদী এলাকায় সালফার নামক মাকড়নাশক প্রোফাইলেকিটক হিসেবে কমপক্ষে ২ রাউন্ড ৭ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।
- বিটিআরআই অনুমোদিত মাকড়নাশক ও এর সঠিক মাত্রা অনুসরণ করতে হবে। ইচ্ছামাফিক মাত্রা পরিবর্তন করা যাবে না।
- মাকড়নাশক সিঞ্চনকালে অবশ্যই পূর্ণ বয়স্ক ও কচি পাতার উভয় দিকে টার্গেট পয়েন্ট রেখে সিঞ্চন নল ও নজল চা গাছের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক nozzle উল্টিয়ে সিঞ্চন নিশ্চিত করতে হবে।
- এপ্রিল-মে মাস: মেট্রিন ০.৫% অথবা প্রোপারজাইট ৫৭ইসি @ ১.০ মিলি/লি, এবং জুন-আগস্ট মাস: ফেনাজাকুইন ১০ ইসি @ ০.৬ মিলি/লি অথবা এমামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসিজি @ ০.৫ প্রা./লিটার পানিতে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

(ক)

(খ)

(গ)

চিত্র ১৫: ক) পূর্ণ বয়স্ক লাল মাক; খ) মাকড় আক্রান্ত পাতা; গ) মাকড় জীবনচক্রের বিভিন্ন ধাপ

উইপোকা:

চায়ে উইপোকা সাধারনত ‘উলুপোকা নামে বেশ পরিচিত। মৌমাছির মতো এর সামাজিক পতঙ্গ। ইহা চায়ের অন্যতম মুখ্য ক্ষতিকারক পোকা। চা গাছের মরা-পচা বা জীবন্ত অংশ খায়। এরা মাটির ও গাছের গুড়িতে ডিবি তৈরী করে বাস করে। এদের কলোনিতে রাজা, রাণী, সৈনিক ও শ্রমিক উইপোকা একত্রে বাস করে। কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই চা গাছ খেয়ে থাকে। সাধারণত শীত মৌসুমে উঁইপোকার আক্রমণ প্রকট হয়। বর্ষা মৌসুমে এদের মাটির পলিপথ ধুয়ে যায় বিধায় আক্রমণের মাত্রা/তীব্রতা কমে যায়। সাধারণত এদের আক্রমণে প্রায় ২২.৫৬% শস্য ক্ষতি হয়ে থাকে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

- ইউপোকা প্রতিরোধী জাত/ক্লোন নির্বাচন করতে হবে। বিটি৪, বিটি৬, বিটি ৭, বিটি ৮ ও বিটি ৯ ক্লোন সমূহ উঁইপোকা প্রতিরোধী জাত।
- তিন বছরের প্রুনিং চক্র (এলপি-ডিএসকে-এলএসকে) উঁইপোকা প্রাদুর্ভব কমাতে সাহায্য করে।
- খাবারের ফাঁদ মেন-মরা বাঁশের খণ্ড, নরম কাঠ, বগামেডুলা ব্যবহার করে উঁইপোকার আবির্ভাব সনাক্তকরণ ও ধ্বংস করা।
- চা আবাদীতে উঁইপোকা নিয়ন্ত্রণের সর্বাধিক টেকসই ও কার্যকরী পদ্ধতি হলো রাণী উঁইপোকা সংগ্রহ। উঁইপোকা রাণী সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। এতে বংশবৃদ্ধি ব্যহত হবে। সঠিক ও যথাযথ উপায়ে কলোনী ধ্বংস করতে হবে যাতে একই কলোনীতে পুনরায় রানী উঁইপোকা জন্মাতে না পারে।
- প্রতি লিটার পানিতে ইমিটাক্লোরোপিড ২০ এসএল @ ১.৫ মিলি. (বছরে এক বার) অথবা ক্লোরোপাইরিফোস+সাইপারমেথ্রিন ৫০৫ ইসি (বছরে তিন বার) @ ৪.০ মিলি. ভালো ভাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।
- কীটনাশক প্রয়োগের পূর্বে অবশ্যই গাছের গোড়ার মাটি ফর্কিং ও পরিস্কার করতে হবে।

(ক)

(খ)

(গ)

চিত্র ১৬: ক) কর্মী উঁইপোকা; খ) রানী উঁইপোকা; গ) উঁইপোকা আক্রান্ত চা বুশ

লুপার ক্যাটারপিলার:

ক্ষতিকারক ক্যাটারপিলারের পরিণত দশা হলো মথ (Moth)। পুরুষ ও স্ত্রী মথের মিলন পরবর্তী ডিম থেকেই ক্যাটারপিলারের জন্ম হয়। এটি ক্যাটারপিলারের ১ম লার্ভাল ধাপ (1st inster) এবং এ ধাপেই ইহা চা গাছ ও সংশ্লিষ্ট ছায়াতরুর পাতা খাওয়া শুরু করে। ক্যাটারপিলার মোট পাঁচটি লার্ভাল ধাপ সম্পন্ন করে। পরিণত ক্যাটারপিলার দেখতে পিছনে ও পার্শ্বে সবুজাব সাদা রেখা সমৃদ্ধ ধুসল বাদামী বর্ণের এবং বাদামী মাথা বিশিষ্ট। এদের প্রধান বৈশিষ্ট্য চলার সময় লুপ তৈরি করে চলে।

ক্ষতির প্রকৃতি ও ধরন:

- ক্যাটারপিলার চা গাছের কচি পাতার কিনারা ছিদ্র করে এবং পরে কিনারা বরাবর থেকে থাকে। মধ্যশিরা বাদে সম্পূর্ণ পাতাই খেয়ে ফেলে।
- পাতা খাওয়া ক্যাটারপিলারের বৃদ্ধি সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় অর্থ্যাৎ এটি আকারে যত বড় হতে থাকে পাতা খাওয়ার পরিমানও তত বাড়তে থাকে।
- পূর্ণ বয়স্ক ক্যাটারপিলার পরিণত পাতা খেতে শুরু করে এবং আক্রমণ ব্যাপক হলে পুরো গাছটি পাতাবিহীন হয়ে পড়ে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

হাত বাছাইয়ের মাধ্যমে তা সংগ্রহ এবং মেরে ফেলা যায়। প্রুনিংকালীন সেকশন ফর্কিং এর মাধ্যমে সেখানে লুকিয়ে থাকা পিউপা (ফোকুন) ধ্বংস করা সম্ভব। হলুদ ফাঁদ ক্যাটারপিলারের মথকে আকৃষ্ট করে থাকে। তাই হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করে পূর্ণাঙ্গ মথ দমন করা যায়। এছাড়াও লিটার প্রতি ১ মিলি. হারে এবামেকটিন বেনজয়েট ৫ এসজি অথবা সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি অথবা ডেল্টামেথ্রিন ২.৮ ইসি এর যে কোন পানিতে মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। ৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই ২ রাউন্ড স্প্রে করা বাঞ্চনীয় সিঞ্চনকালে চা গাছের উপরের এবং মাঝের ক্যানেপির কচি ও পরিণত পাতার বিশেষ নজর দিতে হবে।

(ক) (খ) (গ)

চিত্র: ১৭: ক) পরিনত মথ; খ) পরিনত ক্যাটারপিলার; গ) লুপার ক্যাটারপিলার আক্রান্ত পরিণত পাতা

থ্রিপস:

এটি সাধারণত অপ্রস্ফুটিত কুঁড়ির মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় আক্রমণ শুরু করে। কুঁড়ির রস শোষনের ফলে প্রস্ফুটিত শুট হলুদাভ রং এবং আকৃতি কিছুটা বিকৃত হয়। ক্রমাগত রস শোষণে পাতার নিম্ন পৃষ্ঠভাগে মধ্যশিরা বরাবর দু'পাশে সমান্তরাল দুটি লম্বা রেখা পরিলক্ষিত হয়।

- থ্রিপস প্রবণ এলাকায় মনিটরিং কার্যক্রম বাড়াতে হবে।
- আক্রান্ত সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়া প্রদানকারী গাছ লাগাতে হবে।

- প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।
- গাছের আক্রান্ত অংশ অর্থ্যাৎ কচি ডগা ও পাতার উভয়দিকে স্প্রে নজল ঢুকিয়ে ভালো ভাবে স্প্রে করতে হবে।
- লিটার প্রতি ১ মিলি. হারে ক্লোরফেনাপির ১০এসি অথবা ১.৪ মিলি. হারে মেট্রিন ০.৫% পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(ক)

(খ)

(গ)

চিত্র ১৮: ক) পডরিণত থ্রিপস; খ) থ্রিপস আক্রান্ত শ্যুট (সম্মুখ অংশ); গ) থ্রিপস আক্রান্ত শ্যুট (পৃষ্ঠদেশ)

এফিড:

এদেরকে জাবপোকাও বলা হয়। নার্সারী ও অপরিনত চায়ের অন্যতম অনিষ্টকারী কীট। আবাদী এলাকায় ছাঁটাই উত্তর নতুন কিশলয়ে আক্রান্ত পরিলক্ষিত হয়। দলবদ্ধভাবে বিভিন্ন বয়সের এফিড চায়ের কচি ডগা ও কচি পাতার রস শূষে নেয়। তাই বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এদের অবস্থানের পাশাপাশি কালো পিঁপড়া দেখা যায়। ডিসেম্বর-মার্চ মাস পর্যন্ত ও পোকার আক্রমণ তীব্র থাকে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

- নার্সারীতে হাত বাছাই উত্তম পদ্ধতি।
- আবাদীতে প্লাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।
- বায়েকন্ট্রল এজেন্ট হিসেবে লেডি বার্ড বিটল ব্যবহার করলেও এফিড কমানো যায়।
- প্রতি লিটার পানিতে ১ মি.লি. হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি পানিতে মিলিয়ে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। কঁচি ডগা ও কচি পাতার নিচে স্প্রে করতে হবে।

চিত্র ১৯ : এফিড আক্রান্ত শুট ও পোকা

জেসিডঃ

জেসিড বা সবুজ নার্সারী ও অপরিনত চায়ের অন্যতম অনিষ্টকারী কীট। আবাদী এলাকায় ছাঁটাই উত্তর নতুন কিশলয়ে এদের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এরা চায়ের পাতার রস শূষে দেয়। আক্রান্ত পাতা নৌকাকৃতি ধারণ করে ও কিনারা শুকিয়ে যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনাঃ

- আক্রান্ত সেকশনে পর্যাপ্ত ছায়াদানকারী গাছ লাগাতে হবে।
- সেকশন অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- প্ল্যাকিং রাউন্ড অবশ্যই ৭-৮ দিন অনুসরণ করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ১ মি. লি. হারে সাইপারমেথ্রিন ১০ ইসি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। কচি ডগা ও কচি পাতার নিয়ে স্প্রে করতে হবে।

(ক)

(খ)

চিত্র ২০: ক) পরিনত জেসিড; খ) ডেসিড আক্রান্ত শুট ও পাকা

ফ্লাশওয়ার্ম/লিফ রোলারঃ

এরা মথ জাতীয় পতঙ্গের অপরিণত দশা। দেখতে লেদা পোকার মত। দুটি পাতা ও একটি কুড়িকে গুটিয়ে পাটি-সাপটার মত মোড়ক তৈরি করে ফ্লোশওয়ার্ম এর ক্ষেত্রে। অপরদিকে, পরিনত পাতা পৃষ্ঠভঅগের দিকে রোল (গুটিয়ে) করে পতার ভিতরে অবস্থান করে (লিফ রোলার)। মোড়কের ভিতরে থেকে কচি কিশলয় কুড়ে কুড়ে খায়। নার্সারী ও অপরিণত আবাদি এলাকায় ছাঁটাই উত্তর নতুন কিশলয়ে ও সমস্যা ব্যাপক।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা:

- হাত বাছাই উত্তম পদ্ধতি। হাত বাছাই করে মোড়ক অংশটি বিনষ্ট করলে পোকাটি মারা যাবে।

(ক) (খ) (গ)

চিত্র ২১: ক) অপরিণত দশা (লার্ভা); খ) ফ্লাশওয়ার্ম আক্রান্ত শুট; গ) লিফ রোলার আক্রান্ত শুট

কীটনাশক আক্রমণের লক্ষ্যস্থল:

টেবিল-১২

লাল মাকড়	পাতার উভয় পিঠ
চা-মশা	পাতার উপরিভাগ ও বুশের ভিতর
ফ্লাশওয়ার্ম	কিশলয় ও কচি পাতার উভয় পিঠে
এফিড	বড় পাতার নীচের পিঠে ও কচি পাতার সর্বদিক লক্ষ্য করে
জেসিড	বড় পাতার নীচের দিক ও কচি পাতার উভয় দিক
থ্রিপস	গাছের উপরের এলাকা বা চয়ন তলে
লিফ রোলার	গাছের উপরের এলাকা
সুপার ক্যাটারপিলার	পাতা ও কান্ড একনাগড়ে সিঞ্চন করা
উঁইপোকা	গাছের গোড়া, কান্ড, কলার এলাকা, শাখা-প্রশাখা
কৃমিপোকা	বীজতলার ও ডিপি নার্সারীর মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজেন কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে

স্প্রে মেশিনের সম্ভাব্য ত্রুটি সংশোধনী ছক:

টেবিল-১৩

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	ত্রুটি সংশোধন পন্থা
স্প্রে বন্ধ হওয়া অসম স্প্রে হওয়া চিকন ধারায় স্প্রে হওয়া	পাম্প বা নজল বন্ধ হওয়া	নজল পরিস্কার করা পাম্প পুনঃসংযোগ করুন
ধীরে ধীরে স্প্রে হওয়া স্প্রে কৌণিক বিস্তৃতি কম হওয়া	অতি নিম্ন চাপ	পাম্প করে মেশিনের চাপ বাড়ান
অতি শীঘ্র চাপ কমে যাওয়া ঔষধ চুয়ে পড়া	ফিল্টার ক্যাপ ডিলা বা ডায়াফ্রাম নষ্ট হওয়া	ফিল্টার ক্যাপ পরিবর্তন/পুনঃসংযোজন করুন ডারাফ্রাম/ওয়াসার পরিবর্তন করুন

কীটনাশক ব্যবহারে সতর্কতা:

উদ্ভিদ সংরক্ষণে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেহেতু ইহা বিষ তাই কীটনাশকের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এদের সংরক্ষণের জন্য গুদামঘর থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায়ে সিঞ্চন পর্যন্ত নিরাপদ প্রয়োগবিধি জানা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

চা একটি খাদ্য সামগ্রী। তাই আবাদী চাতে পাতা চয়নের পরেই কেবলমাত্র কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে। আবাদীতে প্রয়োগের পর কমপক্ষে ৭-৮ দিন অপেক্ষাকাল হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে চয়নকৃত চা পাতায় কীটনাশকের বিষকণা সহনশীল মাত্রায় (এমআরএল) থাকবে। কীটনাশক ব্যবহারে করণীয় ও নিষিদ্ধ নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলা বাঞ্জনীয়। প্রয়োজনে বিটিআরআই-এর পরামর্শ নিতে হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি কীটনাশক দ্বারা ঘটনাক্রমে আক্রান্ত হয়েই যায়, তবে অবিলম্বে নিকটস্থ চিকিৎসকের নিকট পৌঁছাতে হবে।

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ:

১. পোকামাকড়ের মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
২. পোকামাকড়ের আক্রমণের সময় ও ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ করা।
৩. প্রয়োগ সময় অনুযায়ী সঠিক ও ভালো মানের এবং গ্রুপের কীটনাশক (কন্টাক্ট/সিস্টেমিক) নির্বাচন করা।
৪. একই গ্রুপের কীটনাশক পুন:পুন প্রয়োগ না করে ভিন্ন গ্রুপের কীটনাশকের ব্যবহার করা।
৫. পোকামাকড়ের অবস্থান ও গতিবিধি মোতাবেক যথাযথ স্থানে কীটনাশক প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
৬. কীটনাশকের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করতে পরিস্কার পানি ও ঔষধের সঠিক মিশ্রন (অনুমোদিত মাত্রা ও ঘনত্ব) নিশ্চিত করা।
৭. কীটনাশক অবশ্যই রেজিস্টার্ড ডিলার হতে ক্রয় করা উচিত।
৮. ষ্টোরে/গুদামে পৃথক পৃথক ঔষধ লেবেল লাগিয়ে আলাদাভঅবে রাখা উচিত।
৯. প্রচন্ড বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের সময় কীটনাশক সিঞ্জন করা থেকে বিরত থাকা।
১০. দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোক দ্বারা কীটনাশক সিঞ্চন করা উচিত।

চা কারখানা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে কালো চা (Black Tea) বেশ জনপ্রিয়। কারখানায় এই চায়ের উৎপাদন পদ্ধতি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয়' তথা-পাতা শুষ্ককরণ, চুর্ণকরণ (সিটিসি), গাঁজনদহন (জারণ), বাঁছাইকরণয়ের গুনাগুণ মূলত এবং প্যাকেজিং ও চালান। চা (গ্রেডিং) বাগানেই প্রস্তুত হয়, ফ্যাক্টরীতে ইহা সংরক্ষণ করা হয় মাত্র। যেমন, দুটি পাতা ও একটি কুঁড়িযুক্ত কচি কিশলয় থেকে তৈরি চা উচ্চ মানসম্পন্ন হয়। অপরদিকে, তিন বা তার অধিক পাতা ও এক কুঁড়ি থেকে তৈরি চা নিম্নমানের হয় এবং তন্তুর পরিমাণও বেশী থাকে। যাহোক, চা গ্রেডিং এবং বস্তাবন্দী করার পর বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম নিলাম কেন্দ্রে পাঠানো হয়।

উইদারিং বা পাতা শুষ্ককরণ:

উইদারিং বা পাতা শুষ্ককরণ বলতে সদ্য চয়নকৃত পাতার সজিবতা হ্রাস করাকেই বুঝায়, যা ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে-১২/১৮ ঘন্টার মধ্যে সম্পন্ন হয়। সাধারণত দুটি পাতা একটি কুঁড়িযুক্ত সজীব কিশলয় ৭৪-১৭% পানি এবং ৮৩-২৬% কঠিন পদার্থ বহন করে। ভৌত উইদারিং প্রক্রিয়ায় পাতা পানি হারিয়ে নিস্তেজ বা শিথিল হয়, ফলে কোষ পর্দার ভেদ্যতাপ্রবেশ্যতা বেড়ে/ টুকরোকরণ এবং জারণ প্রক্রিয়া ভালভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়। পরবর্তী ধাপে পাতা রোলিংয়ে, ৭০ উইদারিং সিটিসি এর জন্য আদর্শ ধরা হয়। এটি বলতে বুঝায়, ১০০ কেজি সদ্য চয়নকৃত সজীব চা পাতাকে নির্দিষ্ট সময় ধরে উইদারিং করার পর ৭০ কেজিতে নামিয়ে আনা। সিটিসির সময় আদর্শ উইদারিং সম্পন্ন পাতা থেকে পানি বেরিয়ে এসে আবার চুর্ণকৃত পাতার সবুজ কণায় মিশ্রিত হয়, ফলে পানি ফোঁটায় ফোঁটায় মেঝেতে পড়ে না। উইদারিংয়ের সময় ভৌত পরিবর্তনের সাথে সাথে নিম্নলিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়াও সম্পন্ন হয়।

ক) পলিফেনল অক্সিডেজ নামক এনজামেই কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

খ) ক্যাফেইন এর মাত্রা সূসংবদ্ধ হয়।

গ) সবুজ ক্লোরোফিল ভেঙ্গে যায়, একই সাথে পেপসিডেজ নাম এনজাইমের দ্বারা প্রোটিনসমূহ সরল অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত হয়, যা চায়ের সুগন্ধ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

ঘ) রঙ্গিন ক্যারটিনয়েড এর পরিবর্তন ঘটে। জৈব এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, চা চায়ের সুরভি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।

ট্রাফ উইদারিং:

একটি আদর্শ ট্রাফ (ঢাকনাবিহীন সরু লম্বা আধার) ২৩ মিটার লম্বা (অথবা যে কোন দৈর্ঘ্য), ১.৮২ মিটার প্রস্থ এবং ১.৫ মিটার উচ্চতার হতে পারে। চয়নকৃত পাতা ট্রাফের উপরের অংশে তাদের জালিকার উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়। নিচের অংশে দৈর্ঘ্য বরাবর সুড়ঙ্গ পথে মুক্ত অথবা হালকা গরম বাতাস ট্রাফের প্রান্তদেশে স্থাপিত পাখায় সাহায্যে প্রবাহিত করা হয়। (প্রতি মিনিটে প্রতি বর্গমিটার ট্রাফের জন্য ১০ ঘনমিটার বাতাস)। উইদারিং ট্রাফে পাতা এমনভাবে ছড়ানো হয় যেন এর পুরুত্ব ৮ ইঞ্চি হয় বা প্রতি বর্গমিটারে ২৫ কেজি পাতা বিছানো যায়। যদি হাইগ্রোমেট্রিক পার্থক্য (ড্রাই বাল্ব তাপমাত্রা-ওয়েট বাল্ব তাপমাত্রা) ৩ ডিগ্রী এর নিচে চলে আসে তাহলে ট্রাফের সুরঙ্গ দিয়ে গরম বাতাস (৩৫ ড্রিগ্রী সেলিসিয়াসের কম) প্রবাহিত করতে হবে। যদি হাইগ্রোমেট্রিক পার্থক্য ৩ ডিগ্রী এর বেশি হয় তাহলে ট্রাফের সুরঙ্গ দিয়ে মুক্ত বাতাস প্রবাহিত করতে হবে। সঠিক উইদারিংয়ের জন্য কক্ষের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% এর বেশি হওয়া কাম্য নয়। উইদারিং শেষে প্রবাহমান মুক্ত বাতাসে চা পাতা ঠান্ডা করা আবশ্যক।

রোলিং/চুর্ণকরণ:

উইদারিংয়ের পর নিস্তেজ চা পাতাকে চুর্ণকরণের পূর্বে সিফটার বা চালুনি যন্ত্রের সাহায্যে অনাকাঙ্খিত দ্রব্যদি পৃথক করা হয়। রোলিংয়ের উদ্দেশ্য হলো চা পাতাকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত করা। উপরন্তু রোলিংয়ের সময় অত্যাধিক চাপে পাতার অভ্যন্তরীণ রস বেরিয়ে এসে পত্রকণার উপর সুক্ষ আবরণ তৈরি করে, যা রাসায়নিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সময়ই পত্র কোষের রসগহবরে বিদ্যমান পলিফেনলস্ তথা ক্যাটেচিন পলিফেনল অক্সিডেজ নাম এনজাইমের সাহায্যে জারিত হয়ে থিয়াফ্লাভিনে রুপান্তিরিত হয়। রোলিংয়ের সময় পাতার সবুজ অঙ্গানু তথা ক্লোরোফিল ভেঙ্গে যায়, এবং চায়ের লিকারের সুগন্ধি ও বর্ণের জন্য দায়ী জৈব-যৌগসমূহের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও, যেসব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎসেচকের প্রয়োজন হয় না সেসব বিক্রিয়াসমূহও ঘটতে থাকে।

রোটরভেন:

উইদারকৃত পাতা থেকে সিফটারের সাহায্যে অনাকাঙ্খিত দ্রব্যদি পৃথক করার পর চুর্ণকরণের উদ্দেশ্যে প্রথমে রোটরভেন নামক যন্ত্রে প্রেরণ করা হয়। এসময় সিটিসি যন্ত্রের সাহায্যে উত্তম পত্র-কনাপিন্ড বা দোল তৈরি এবং রোটরভেনে পাতা প্রেরণের মধ্যে সমতা বিধান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রোটরভেন মূলত একটি সিলিন্ডার আকৃতির ড্রাম (ব্যাস ৮ অথবা ১৫ অথবা ১৮ ইঞ্চি হতে পারে)। যা ঘুণায়মান কিন্তু যন্ত্র যথা-ফিল্ড ওয়ার্ম, সিলিন্ডারের অভ্যন্তরে সংযুক্ত রোধক (রেজিস্টার), ঘুর্ণায়মান মূল শ্যাফটে সংযুক্ত পাত বা ভেন এবং নির্গমন মুখের সমন্বয়ে গঠিত। নির্গমন মুখে আইরিশ প্লেট বা কোন/মোচক সরু ফালির সাথে যুক্ত থাকে যা শ্যাফটের বিপরীতে কাজ করে। উইদারকৃত পাতা হোপারের মাধ্যমে প্রবেশ করানোর পর ফিল্ড ওয়ার্ম কর্তৃক দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং পরে ভেন এবং রোধকের মদ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় পুড়ো হয়ে নির্গমন মুখ দিয়ে বের হয়ে সিটিসি যন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়। রোটরভেনে প্রয়োগকৃত চাপ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে কেবলমাত্র পাতা থেকে রস বের হয়ে গুড়োকৃত পাতার উপর আবরণ সৃষ্টি করে। যাহোক,

রোটনভেনের মাধ্যমে পাতা ভালভাবে পুড়ো বা প্রস্তুত করার জন্য উইদারকৃত পাতার ৬৫% পানি থাকা বাঞ্ছনীয়, তবে রোটরভেনের তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হওয়া উচিত নয়। রোটরভেনের মধ্যে দোলের অতিরিক্ত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য (Green Leaf Shredder) ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, রোটরভেন থেকে পাতা বের হয়ে সিটিসি যন্ত্রে প্রবেশের পূর্বে টুকরো চা পাতার পিন্ডকে ঠান্ডা করার জন্য বল ব্রেকার বসানো প্রয়োজন।

চয়িত সবুজ পাতা সংরক্ষণ

চয়িত পাতা চয়নের পর চা প্রস্তুত কারখানায় নিয়ে যাবার পূর্ব পর্যন্ত বাগানের যে স্থানে পাতা রাখা হয় তাকেই পাতিঘর (Leaf house) বলা হয়। পাতিঘরটি বাগানের এমন এক স্থানে নির্মাণ কতে হবে যাতে পাতা সহজেই পরিবহন করে কারখানায় নিয়ে যায়। পাতার সজীবতা ঠিক রাখতে পাতিঘরটি ঠাণ্ডা রাখতে হবে। সে জন্য ঘরটির চারপাশে খোলা রাখা ও ঘরটির ছাদ টিনের পরিবর্তে-ছন-বাঁশ দিয়ে তৈরি করাই ভাল। ঘরটিতে পাতা স্তুপ করে না রেখে মেঝেতে হালকাভাবে ছড়িয়ে রাখতে হবে। পাতা না ঠেঁসে বাঁশ/বেতের টুকরীতেও বেশ কয়েকঘন্টা রাখা যায়। উভয় ক্ষেত্রে এক-দেড় ঘন্টা পর পাতা আলতোভাবে নেড়ে উলটিয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থায়ই যেন পাতা অতিরিক্ত ছানানোর ফলে ছেঁচে বা অতিরিক্ত গরমে তামাটে না হয়ে যায়। সেজন্য মেঝে পাকা হওয়া উচিত। তা সম্ভব না হলে মেঝে বাঁশের চাটাই বিছিয়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন বিছানো পাতার গাছে মেঝেতে থেকে ধূলিকনা লেগে না যায়।

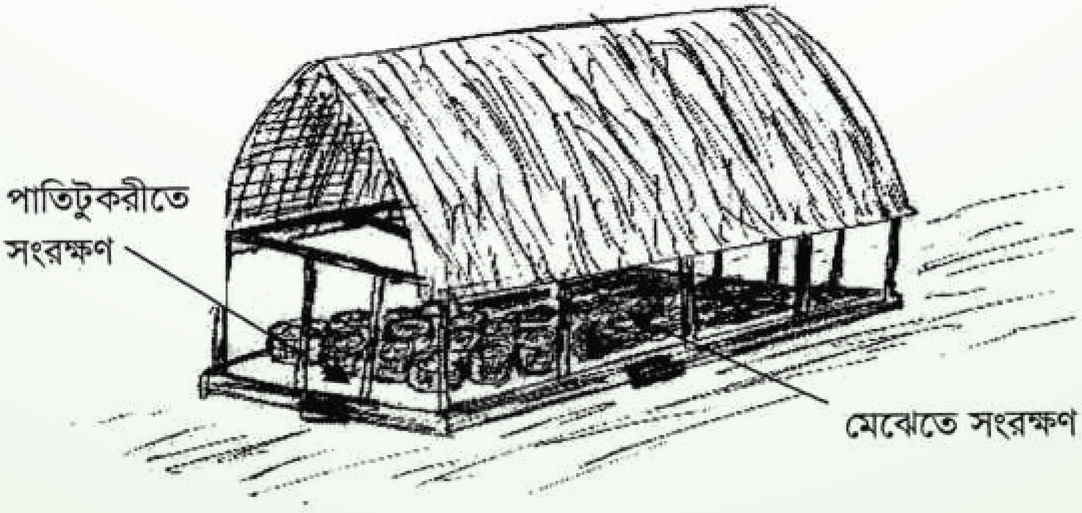

সবুজপাতার প্রাথমিক সংরক্ষণ পাতিঘরের স্কেচ

চিত্র-২২

সবুজপাতা ফ্যাক্টরি/বিক্রয় কেন্দ্র পর্যন্ত পরিবহন

সবুজপাতা পরিবহনের সময়ও পাতা যাতে সজীব থাকে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখা যায় যে পরিবহনের সময় চাপে ও অতিরিক্ত তাপে পাতা গরম হয়ে তামাটে রং ধারণ করে যা চায়ের গুণগতমান দারুণভাবে কমিয়ে দেয়। সে জন্য ট্রাক্টর/ট্রাক/ভ্যানে নিয়ে যাবার সময় হালকাভাবে পাতা রেখে উপরে ছায়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। তাছাড়া বাঁশের টুকরীতে পাতা হালকাভাবে ভরে পরিবহন করলে অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়।

চিত্র ২৩ : পাতা চয়নের পর সংরক্ষণ পদ্ধতি

চিত্র ২৪ : সদ্য চয়নকৃত পাতা টুকরীতে রাখারা সঠিক পদ্ধতি

তাপূর্ণ টুকরীগুলি গাছের ছায়ায় রাখা পদ্ধতি

সিটিসি:

ক্রাশ (পিষা), টিয়ার (বিচ্ছিন্ন করা) এবং কার্ল (পাকান) বা সিটিসি যন্ত্র সমান্তরাল ও আনুভূমিকভাবে বিপরীতমুখী ঘূর্ণায়মান একজোড়া স্টেইলেস স্টিলের রোলারের সমন্বয়ে গঠিত। এই দুটি রোলারে ঘূর্ণন গতির পার্থক্য ১:১০ হয়। রোলারের ব্যাস ২০.৩-২০.৯৫ সেমি এর মধ্যে হয়ে থাকে। রোলারের পৃষ্ঠদেশ সারিবদ্ধ দাঁত (প্রতি ইঞ্চিতে ৮টি বা ১০টি) এবং ৫০ অথাব ৬০টি প্যাঁচানো খাঁজ থাকে। দুটি গূর্ণায়মান রোলারের মধ্যবর্তী ফাঁকের পরিমাণ ০.০৫ মিলিমিটার হয়।

রোটরভেন থেকে আসা টুকরো পাতা প্রথমে ধীরে বা ৭০ আরপিএম বেশে ঘূর্ণায়মান রোলারের উপর পতিত হয়। এরপর দ্রুত বা ৭০০ আরপিএম বেগে বিপরীতমুখী ঘূর্ণায়মান রোলার এবং ঐ রোলারে পৃষ্ঠদেশে সাথে টুকরোকৃত পাতার এক ধরনের আপেক্ষিক গতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে রোলারের দাঁতের ধারালো অংশ দিয়ে পাতাগুলো পুনরায় সুক্ষভাবে কেটে টুকরো করা হয়। রোলারের দাঁতের কাঁধ ও খাঁজগুলোকে কাজে লাগিয়ে টুকরো পাতাকে পিষানো হয়, এবং একইসাথে রোলারের দুই দাঁতের পার্শ্বদেশীয় ঘর্ষণজনিত ক্রিয়ায় পিষানো পাতা পাকানো হয়। এরপর এই পাতাকে ঘূর্ণয়ায়মান পরিবাহক বেল্টের সাহায্যে পুনরায় অতি সুক্ষভাবে কাটার জন্য পরবর্তী রোলারে প্রেরণ করা হয়। উত্তম গাঁজন/জারণের জন্য রোলিংয়ের সময় কক্ষের তাপমাত্রা ২৭/২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

আদর্শ চেজিং (রোলারের দাঁতের প্রোফাইল):

ক. ৮ টিপিআই X৫০ (মিলিং গভীরতা=০.০৮০ ইঞ্চি, চেজিং গভীরতা=০.০৯৬ ইঞ্চি)। প্রতি ইঞ্চিতে ৮ দাঁত বিশিষ্ট রোলার সাধারণত পাতি চা/ফিড গ্রেড উৎপাদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

খ. ১০ টিপিআই X৫০ (মিলিং গভীরতা=০.০৬৮ ইঞ্চি, চেজিং গভীলরা= ০.০৮০ ইঞ্চি) প্রতি ইঞ্চিতে ১০ দাঁত বিশিষ্ট রোলার সাধারণত গুড়া/ডাস্ট গ্রেড উৎপাদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

গ). চায়ের চমৎকার গ্রেডের জন্য ১ম এবং সর্বশেষ রোলার ৮ টিপিআই এবং মাঝের গুলো ১০ টিপিআই থাকা বাঞ্চনীয়।

ঘ) দাঁতের কাঁধ (Soulder) এবং ঢালুর (Slope) অনুপাতেঃ লিফ গ্রেডের জন্য ৩ঃ ৭ থেকে ৩ঃ৫ এবং ডাস্ট গ্রেডের জন্য ১ঃ১ হওয়া দরকার। কাঁধ/ঢালুর অনুপাত চায়ের গ্রেড নির্ধারণে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কাঁধের অংশে কাটিং এবং চালু অংশে পাতা কার্লিং হয়।

ঙ) লিফ গ্রেডের জন্য মিলিং কোন ৬০-৬৫ ডিগ্রি এবং ডাস্ট গ্রেডের জন্য ৫০-৫৫ ডিগ্রী হতে হয়।

চ) সিটিসি যন্ত্রের রোলারে ভোঁতা দাঁত থাকা কাম্য নয়। ৭০ ঘন্টা কিংবা ১৬৩০ কেজি পাতা প্রসেসিংয়ের পর তা পুনরায় ধারালো করে নেওয়া আবশ্যক।

ছ) ১৫ ইঞ্চি ব্যাসের রোটরভেনের জন্য সিটিসি রোলারের ব্যাস ২৪ ইঞ্চি অথবা ৩০ ইঞ্চি এবং ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের রোটরভেনের জন্য সিটিসি রোলারের ব্যাস ৩৬ ইঞ্চি অথবা ৪৮ ইঞ্চি হতে পারে। সিটিসি এর সময় রোলারের সাহায্যে পাতাকে সাধারণত ৩-৫ টি কাট দেওয়া হয়। এই অঞ্চলে বিচুর্ণ চা পাতায় বা দোলে ৬৭-৭২% পানি থাকে, কিছু পঞ্চম কাটে ইহা ৬০% এ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। চা প্রকিয়াকরণের পর প্রতিদিন সিটিসি মেশিন পরিষ্কার পানি দিয়ে ধূয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

সিটিসি-ঘুগীঃ

সিটিসি যন্ত্রের সাহায্যে চা পাতা চূর্ণ-বিচুর্ণ করার পর পত্রকণিকা/দোলসসমূকে একটি ঘূর্ণায়মান চোঙ্গা আকৃতির সিলিন্ডারে বা ঘুগীতে প্রেরণ করা হয়, যা আনুমানিক ২০ আরপিএম এ ঘুরতে থাকে। ঘুগীর মধ্যে দোল/কণিকাসমূহ নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি ধারণ করে। ঘুগীতে রোকেন গ্রেডের অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে দৃশ্যমান ফাইবারগুলো অবিরত ঘূর্ণায়নের মাধ্যমে নিমজ্জিত হয়ে যায়, এবং দোলের অভ্যন্তরীণ তাপমাত্রাও কমতে থাকে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে চায়ের লিকারের মান কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

সিটিসি এর মাধ্যমে সবুজ পাতা প্রক্রিয়াকরণের পর সিক্ত-চুর্ণ পত্রকণা মেঝেতে অথবা নিরবচ্ছিন্ন গাঁজন যন্ত্রে (সিএফএম) ক্রমানুগতভাবে গাঁজন বা জারনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। গাঁজনের সময় চায়ে বিদ্যমান পলিফেনলস তথা ক্যাটেচিন পলিফেনল অক্সিডেজ নাম এনজাইমের সাহায্যে জারিত হয়ে থিয়াফ্লাভিনে রূপান্তরিত হয়। এই থ্রিয়াফ্লাভিন কিছুটা কমলা ও লালচে বর্ণের হয়ে থাকে; যা চায়েল কষ, উজ্জ্বলতা, সজীবতা ও বর্ণের জন্য দায়ী। কালো চায়ে শুষ্ক ওজনে ০-২-২% থিয়াফ্লাভিন থাকে, তবে লিকারে ১-৬% পর্যন্ত পাওয়া যায়। চায়ে থিয়াফ্লাভিন বেশি থাকলে লিকারের মান ভাল হয়, কিছু কম মাত্রায় থাকলে লিকার নীরস হয়।

এছাড়াও, গাঁজন পক্রিয়ার সময় ডাইক্যাটোচিনসমূহ ও থিয়াব্লাউন জারিত হয়ে থিয়ারুবিজিনে রুপান্তরিত হয়। থিয়ারুবিজিন কিছুটা লালচে-বাদামি তথা তামাটে বর্ণের হয়ে থাকে। এটি সাধারণত চায়েল দৃঢ়তা, ঐশ্বর্যতা ও বর্ণের জন্য দায়ী। চায়ে শুষ্ক ওজনে- ১৯% থিয়ারুবিজিন পাওয়া। কালো চা'য়ে থিয়াফ্লাভিন ও থিারুবিজিন এর অনুপাত ১:১০ থেকে ১:১২ এর মধ্যে থাকা আবশ্যক।

মেঝেতে গাঁজন প্রক্রিয়া:

এই প্রক্রিয়অয় সিক্ত-চুর্ণ পত্রকণা তথা দোলসমূহকে পরিষ্কার সিমেন্টের মেঝে/ষ্টিলের পাত/চকচকে টাইলসের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়। অক্সিজেন সমভাবে যাতে দোলের মধ্যে বিস্তৃত হয় এজন্য এর গুরুত্ব ১-২ সেমি (৮-৯ কেজি/বর্গমিটার) এর মধ্যে রাখা হয়। গাঁজন/কারন কক্ষে বায়ু চলাচলের সঠিক ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং সেই সাথে কক্ষের তাপমাত্রা ২৭-২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং আপেক্ষিক আদ্রতা ৮৫-৯৫% এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মেঝেতে দোলের রং পরিবর্তন এবং ছড়ানো সুগন্ধ থেকে গাঁজন প্রক্রিয়া সমাপ্তির সময় নির্ধারণ করা হয়।

দহন না শুষ্ককরণ:

বাংলাদেশে Continuos Fermenting Machine (CFM) বা নিরবচ্ছিন্ন গাঁজন যন্ত্র খুবই জনপ্রিয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৫-২০ সেমি (৬-৮ ইঞ্চি) পুরুত্বের বিচুর্ণ চা পাতা বা দোলকে দুই পাশে চেইনের সাথে সংযুক্ত প্লেট বা ট্রেন উপর দিয়ে সম্মুখ দিকে পাঠানো হয়। সিএমএম এর প্লেট সাধারণত সুক্ষ ছিদ্রবহুল হয়ে থাকে যার মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত বায়ু বিচুর্ণ পাতায় বা দোলে প্রবাহিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে গাঁজন সেলসিয়াস তাপমাত্রা বজায় রাখা হয়। গাঁজন কক্ষে হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৫-৯৫% এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

দহন বা শুষ্ককরণ:

দহন বা শুষ্ককরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এনজাইমচালিত জারণ প্রক্রিয়া থামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর গাঁজন/জারনকৃত চায়ের আর্দ্রতা ৫০-৬০% থেকে ২.৫-৩% এ নামিয়ে আনা হয়।

ভাইব্রো ফ্লুইড বেড ড্রায়ার (ডিএফবিডি):

এই দহন যন্ত্রের সাহায্যে একটি নির্দিষ্ট তাপ উৎস থেকে নিয়ন্ত্রিত এবং সমভাবে প্রবাহমান গরম বাতাস চালনার মাধ্যমে সদ্য জারনকৃত চাকে দহন বা শুষ্ক করা হয়। বিএফবিডি প্রধানত কম্পন ও ফ্লুডাইজেশন নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে, যেখানে জারনকৃত চা বা দোল (dhool) একটি ক্রম-অবনমন বা পরিবর্তনশীল বায়ুস্তরের উপর কম্পমান থাকে। ফলে চুর্ণকৃত চা পাতার কণা একইসাথে সমভাবে শুষ্ক হয়। ড্রায়ারের ভিতর এই বায়ু চা কণার বাহক হিসেবে কাজ করে দোলের ভাসমান ও কম্পমান বেডকে সম্মুদিকে তাড়িত করে, যতক্ষণ না পর্যন্ত দহনকৃত চা বিপরীত মুখ দিয়ে নির্গত না হয়। ডিএফবিডি যন্ত্রে গমন পথে ১১৫-১২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা এবং নির্গমন পথে ৫৪-৬০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ড্রায়ারে ২০-২২ মিনিট ধরে এই দহনের কাজটি সম্পন্ন হয়, এবং পরিবেশে দহনকৃত চায়ের আর্দ্রতা ২.৫-৩% এ নামিয়ে আনা হয়। ড্রায়ারের শুষ্ককরণের হার সাধারণত নির্ভর করে প্রতি ঘন্টায় কী পরিমাণ তৈরি চা ড্রায়ার মুখ দিয়ে নির্গত হয় তার উপর। যেমন, এটি হতে পারে ২৫০, ৩০০ বা ৫০০ কেজি/ঘন্টা। তৈরি চা থেকে লোহাজাতীয় কণা আকর্ষণ বা আলাদা করার জন্য ড্রায়ারের মুখে চুম্বক জাতীয় পদার্থ সেট করা যেতে পারে।

জ্বালানি খরচ:

ফার্নেস ওয়েল: প্রতি কেজি চা তৈরি করতে ০.৩-০.৪ লিটার প্রয়োজন।

কয়লা: প্রতি কেজি চা তৈরি করতে ১.০-১.৫ কেজি প্রয়োজন।

জ্বালানি কাঠ: প্রতি কেজি চা তৈরি করতে ১.৬৭ কেজি প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক গ্যাস: ডিএফবিডি এর ক্ষেত্রে প্রতি কেজি চা তৈরি করতে ৮.০-১০.০ আদর্শ ঘনফুট দরকার। কোয়ালিটি ড্রায়ারের ক্ষেত্রে ১৮.০-২০.০ আদর্শ ঘনফুট দরকার।

সদ্য দহনকৃত চায়ে বিভিন্ন আকারের ডাঁটা, ফাইবার মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। গ্রেডিং বা সর্টিংয়ের উদ্দেশ্যে হলো চা থেকে ফাইবার ও ডাঁটা আলাদা করে এবং সেইসাথে ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী চাকে বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে ভাগ করা। প্রথমে ফাইবার পৃথকীকরণ যন্ত্রের (২০০ আরপিএম) স্থিরতড়িৎ, আকর্ষণের সাহায্যে সিটিসি চা থেকে অতিসুক্ষ তন্তু এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাঁটা আলাদা করা হয়। এরপর মিডলটন সর্টার (২০৫ আরপিএম), ডাইব্রো স্ক্রিন সর্টার, ইত্যাদি যন্ত্রের মধ্যে সন্নিবেশিত চালুনি দিয়ে চাকে অতিক্রম করে ছেঁকে পৃথক করা হয়।

চা'য়ের শ্রেণী বা গ্রেডঃ

সিটিসি চায়ের মূলত তিনটি গ্রেড আছে। যথা-

১. ব্রোকেন গ্রেডঃ ফ্লাওয়ারী পেকো (এফপি), ফ্লাওয়ারী ব্রোকেন অরেঞ্জ পেকো (এফবিওপি), ব্রোকেন অরেঞ্জ পেকো (বিওপি) এবং গোল্ডেন ব্রোকেন অরেঞ্জ পেকো (জিবিওপি)। এখানে পেকো (Pekoe) শব্দের অর্থ সুগন্ধযুক্ত কৃষ্ণ বর্ণের চা।

২. ফ্যানিং গ্রেডঃ অরেঞ্জ ফ্যানিং (ওএফ), ফ্লাওয়ারী অরেঞ্জ ফ্যানিং (এফওএফ)। এই দুই গ্রেডকে একত্র করলে তাকে পেকো ফ্যানিং (পিএফ) গ্রেড বলে। এই গ্রেডগুলো বেশ জনপ্রিয়।

৩. ডাস্ট গ্রেডঃ পেকো ডাস্ট (পিডি). রেড ডাস্ট (আরডি). ডাস্ট (ডি) এবং চুরামনি ডাস্ট (সিডি)

কালো চা অত্যধিক পানিগ্রাহী, বায়ুমন্ডল থেকে খুব দ্রুত পানি শোষণ করে। তাই সর্টিংয়ের পর কোন রকম বিলম্ব না করে চা বস্তাবন্দী করতে হবে। তৈরি চায়ে উপস্থিত পানীর পরিমাণের সাথে চায়ের কার্যকারী-জীবনকালের একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চায়ে পানির পরিমান বেশি হলে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই ফ্যাক্টরীতে চা বস্তাবন্দী করার সময় আনুমানিক ৩% এবং বাজারজাতকরনে উদ্দেশ্যে প্যাকেজিংয়ের সময় সর্বোচ্চ ৫% পর্যন্ত পানির উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য। চা কাটিং এবং মোককীকরণ রুমে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মাত্রা ৬০-৬৫% বা তার কম রাখতে হবে। চা বস্তাবন্দী করার সময় অ্যালুমিয়াম ফয়েল বা ওভেন পলি পোরসেলিন (ডব্লইপিপি) ব্যাগ সেট ব্যবহার করতে হবে।

ওভেন পলি পোরসেলিন (ডব্লিইপিপি) ব্যাগ সেটঃ

ক. বাহিরের ব্যাগঃ দৈর্ঘ্য ১১০ সেমি. প্রস্থ ৬০ সেমি. ওজন ১২০-১২৫ গ্রাম।

খ. ভিতরের ব্যাগঃ দৈর্ঘ্য ১২৬ সেমি. প্রস্থ ৭৬ সেমি. পুরত্ব ০.০৬ মিলিমিটার।

ফ্যাক্টরীতে চা মোড়কীকরণের পর চট্টগ্রামস্থ নিলাম কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়, এরপর মার্কেটিং নেটওয়াকিং পদ্ধতির মাধ্যমে সবশেষে ভোক্তার নিকট চলে যায়। কারখানায় চা পাতি দহনের পর তৈরি চা বাঁছাকরণ (গ্রেডিং) এবং প্যাকেজিংয়ের জন্য খোলা ময়লামুক্ত মেঝেতে দীর্ঘ সময় রেখে দেওয়া হয়। গবেষণায় প্রমাণিত যে, চা দীর্ঘ সময় খোলা অবস্থায় মুক্ত পরিবেশে রাখলে তা দ্রুত বায়ুমন্ডল থেকে জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে এবং সেইসাথে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক তথা-এসপারজিলাস, পেনিসিয়াল, রাইজোপাস, ইত্যাদি দ্বরা দুষিত হয়। এই জীবানুগুলি ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ (আফলা টক্সিন, ওকরাইক্রিন) তৈরি করতেও সক্ষম। উন্মুক্ত পরিবেশে তৈরি চায়ের জলকণা শোষণ এবং জীবানুর সংক্রমনের ফলে এর অন্তর্নিহিত গুনাবলী নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে সংরক্ষণকাল তথা কার্যকরী জীবনকালও হ্রাস পায়।

উত্তম উৎপাদন রীতি (জিএমপি):

বিশ্বব্যাপী চা প্রস্তুতকরণ কারখানাগুলিতে ডিএমপি অনুসরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তম উৎপাদন ব্যবস্থা রীতি সম্পন্ন পরিষ্কার, সুরক্ষিত কারখানায় জীবানুর আক্রমণ বহুলাংশে হ্রাস পায়। কারখানায় নিরাপদ চা প্রস্তুতকরণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

১. কারখানা চালু করার পূর্বে সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

২. শুষ্ককরণ কক্ষে পাতার সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. চা উৎপাদনের সময় কারখানায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

৪. চা এবং কারখানার যন্ত্রপাতির সাথে মানুষের সংস্পর্শ যথাসম্ভব কমাতে হবে।

৫. কারখানায় কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যসম্মত কাপড়, গ্লোভস, মুখোশ, জুতা ইত্যাদির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬. প্রস্তুতকৃত চা ময়লাযুক্ত মেঝেতে দীর্ঘ সময় রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৭. কারখানায় দর্শনার্থীদের চলাচল যথাসম্ভব কমাতে হবে।

৮. চা শুষ্ককরণ, বাঁছাইকরণ ও প্যাকেজিং কক্ষে ধুলিকনা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. চা প্রস্তুকরণ শেষে প্রতিদিন কারখানার যন্ত্রপাতি পরিষ্কার পানি এবং মেঝে ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

১০. চা গ্রেডিং থেকে সময়মত প্যাকেজিং এবং চালান নিশ্চিত করতে হবে।

Solidaridad

প্রধান কার্যালয়:
"মেরিডেল (২য় তলা)" ফ্লাট নং- এ ১, বাসা নং- ৩২,
রোড নং- ১০/এ. ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯।
ফোন: +৮৮ ০২ ৮১৯১৩৬৬, + ৮৮ ০২ ৮১৯১৭৮১
www.solidaridadnetwork.org

পঞ্চগড় অফিস:
বাসা- নীড়, হোল্ডি নং- ৩৩৯, ওয়ার্ড নং- ০৮
এশিয়ান ডিস্টিলারী রোড, ধাক্কামাড়া, পঞ্চগড়
ফোন: +৮৮ ০১৭১১১০২৭১৯
ইমেইল: mahamudul.alam@solidaridadnetwork.org

প্রধান কার্যালয়:
কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০
ফোন: ০৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯, ০৮৮-০৫৬১-৫১৫৯৯
মোবাইল: ০৮৮-০১৭৪-০৬৩৩৬০, ০১৭১৩-১৪৯৩৫০
ইমেইল: esdobangladesh@hotmail.com

ঢাকা অফিস:
ইএসডিও হাউজ, প্লট নং-৭৪৮, রোড নং-৮
বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: +৮৮০১৭১৩-১৪৯২৫৯
ফোন: +৮৮-০২-৫৮১৫৪৮৫৭
www.esdo.net.bd